পঞ্চম অধ্যায়

(অমর মিত্রের উপন্যাস ঙ্ম প্রত্নকথার নবনির্মাণ)

অশ্বচরিত

এক

> ‘আসলে সমস্ত শিল্পেরই তো মূল সৌন্দর্য নীরবতা, স্পেস। যেখানে নীরব হয়ে থাকবেন শিল্পী, সে তিনি চিত্রকর হন, গল্পকার হন, ঔপন্যাসিক হন, সেই নীরবতায় আক্রান্ত হবেন পাঠক। উত্তাল সমুদ্রের কাছে গেলে এমন মুহূর্ত কি আসে না? যখন ঢেউ আসছে না, বাতাস বইছে না, অখণ্ড নীরবতায় সমাধিস্থ হয়েছে সিন্ধু। রাত্রিকালে এ অনুভব আরো নিবিড় হয়।
>
> উপন্যাস যেন নীরবতাই ক্রমবিস্তার। আমার মনে হয় উপন্যাস শেষ হয় না। উপন্যাস সিন্ধু প্রমাণ। উপন্যাস সিন্ধুর চেয়েও বড়। যেটুকু লেখা হয়, তা হয়তো কোনো উপসাগর, কোনো প্রণালীর কথা, বাকিটুকুর কথা পাঠক জেনে নেবেন কল্পনায়, অনুভবে।’[১]

উপন্যাস সম্পর্কে এ ভাবনা বর্তমানের বিশিষ্ট আখ্যানকার অমর মিত্রের। স্বাধীনতার চারবছর পর (১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে আগস্ট) জন্মান এই অক্ষরশিল্পীর লেখালেখির জগতে পদার্পণ সত্তরের দশকে। ছোটগল্পে তাঁর সিদ্ধিলাভ একেবারে প্রথম থেকেই। তবে ঔপন্যাসিক হিসেবে চরম সাফল্য ও প্রশ্নাতীত শৈল্পিক উৎকর্ষ লাভ মূলত বিশ শতকের শেষ দশকে। বিষয়ের ব্যপ্তি এবং বৈচিত্র্য তাঁর গ্রাম ও নগর উভয় জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া। বাংলাদেশের খুলনা জেলার এক গ্রামে তাঁর জন্ম হলেও বেড়ে ওঠা কলকাতার আর ভূমিরাজস্ব দপ্তরে চাকুরির সুবাদে পরিচয় গ্রাম বাংলার সঙ্গে। ফলে দু'জায়গার বাস্তব, জনজীবনের ছোটবড়ো ছবি হয়ে উঠলো তাঁর লেখার বিষয়। ‘আমার আনন্দ আমার বিষাদ’ নামক একটি লেখার অমর মিত্র স্বীকার করেছেন গ্রামে যাপন করা দিনগুলো তাঁকে নতুন করে দেখার

দৃষ্টি দিয়েছিল। তিনি লিখেছেন —

> ‘মেদিনীপুরের মাটি জল আমাকে আলো চেনাল প্রথম। আমার সামনে আকাশ খুলে গেল সেই প্রথম যেন। ... এক একটি গ্রাম, এক একটি ভারতবর্ষ। এক একটি নদী, এ একটি সভ্যতা। ... ১৭ বছরের গ্রামবাস, জেলা থেকে জেলায় পরিভ্রমণ আমাকে দেশ চিনিয়েছিল। আমার দেশটার কাঁচাগন্ধ আমি পেয়েছিলাম সুবর্ণরেখার তীরে, কংসাবতীর ধারে, দামোদরের বালিতে, বিহারী নাথ পাহাড়ের কাছাকাছি। ওই দেখার পর শহর কলকাতায় ফিরে শহরটাকে চিনতে শিখলাম নতুন করে। গ্রাম না চিনলে শহর চেনা যায় না। গ্রাম না দেখলে শহর দেখায় কোনো আদল আসে না।’[২]

সাহিত্য জীবনের একেবারে সূচনা থেকেই সমাজ, মানুষের মন ও রাজনীতির বিশ্লেষণ, তাদের মধ্যে সম্পর্কের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা তিনি করেছেন। সত্তরের দশকের যেসব লেখকরা সাহিত্যজগতের পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন তাঁদেরকে কোনো না কোনোভাবে সেই জ্বলন্ত রক্তাক্ত সংগ্রামী সময় প্রভাবিত করেছিল। অমর মিত্র তার ব্যতিক্রম নন। ‘অমৃতলোকে’ প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানান —

> ‘নকশাল আন্দোলন তো আমার চোখ তৈরি করে দিয়েছিল হয়তো। নিরুপায়, বিপন্ন মানুষকে চিনতে শিখিয়েছিল। ভালবাসতে শিখিয়েছিল এই দেশটিকে। এই ই তো অনেক। নগর আসুক, গ্রাম আসুক, নিরুপায় মানুষগুলি তো এসেছে। আদিবাসী জীবন, নিম্নবর্গের জীবন, বিপন্ন মানুষকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করেছিল ওই আন্দোলন।”[৩]

আদর্শের এই জায়গা থেকে তাঁর উপন্যাসের বিষয় হয়ে কখনো হাজির হয় পরমাণু বোমার সফল পরীক্ষার আস্ফালনের বিপ্রতীপে খেতে না পাওয়া মানুষদের কথা (অশ্বচরিত), আবার কখনো স্বাধীন ভারতের জনগণের রক্ষাকর্তা পুলিশের হাতে নিহত মানুষের কথা (নিরুদ্দিষ্টের উপাখ্যান), আর কখনো বা জ্ঞানকে নির্বাসন দেওয়া দেশের তীব্র খরার কথা (ধ্রুবপুত্র)। বিপন্ন, নিরুপায়, অত্যাচারিত মানুষেরাই মিছিল করে হাজির হয় অমর মিত্রের আখ্যানে। আর তাদের অনুচ্চারিত শব্দ, না বলা জীবন কাহিনিকে তিনি ভাষা দেন, কণ্ঠ দেন। আর উপন্যাসকে যিনি ‘নীরবতার ক্রমবিস্তার’, ‘সিন্ধু প্রমাণ’, ‘সিন্ধুর চেয়েও বড়’ বলে অভিহিত করেন, তাঁর উপন্যাসে যে একইসঙ্গে জীবন ও জগতের নানাদিক উঠে আসবে এবং কথার মধ্যেও যে থাকবে আরো অনেক না বলা কথার ব্যঞ্জনা তা বলাই বাহুল্য।

দুই

উপন্যাসের বিষয় ও শৈলী নিয়ে নানা সময়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। বিশেষত, বিশ শতকের শেষ তিন দশক থেকে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ বলাবাহুল্য যে, সময় যখন চূড়ান্ত অস্থির তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই অস্থির সময়কে আত্মস্থ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিকদের গ্রহণ করতে হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পথ ও পাথেয়। তাই পূর্ব নির্ধারিত উপন্যাসের সংজ্ঞা আজ আর যথাযথ থাকছে না। তবে একটি যথার্থ উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অপরিবর্তনীয়, তা আজকের বিশিষ্ট তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায় বলা যায় —

> '... এ সম্পর্কে সম্ভবত দ্বিমত নাই যে প্রতিপাদ্য বিষয় ও প্রকরণ জুড়ে থাকবে সমকালীন সমাজের বয়ান। এই বয়ানে আলো পড়বে চারিদিক থেকে। তবু বর্তমান নিছক বর্তমান থাকবে না উপন্যাসে, হয়ে উঠবে ভবিষ্যৎ অতীতের সন্দর্ভ। ঘটনা হবে এমন যাকে সময়ের চিহ্নায়ক বলে আমরা অনায়াসে বুঝে নিতে পারব।'[৪]

২০০১ সালের বঙ্কিম পুরস্কার জয়ী অমর মিত্রের 'অশ্বচরিত' (১৯৯৯) নামক উপন্যাসটি সমালোচক কথিত এই বাক্যগুলির যথার্থ নিদর্শন। খন্ডসময়ের সামাজিক বয়ান থেকে উঠে আসা চিহ্নায়কগুলি যেমন আখ্যানে স্থান খুঁজে নেয়, তেমনি যে সময় অতীত বর্তমান ছুঁয়ে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বিস্তৃত সেই মহাসময়ের সুরটিও আখ্যানটি আত্মস্থ করে। বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে হারিয়ে যাওয়া এক হোটেলওয়ালার ঘোড়ার অনুসন্ধানের সূত্রে উঠে আসে বিভিন্ন মানুষের জীবন কথা, আসে বর্তমান থেকে ইতিহাস হয়ে প্রাগৈতিহাসিক সময়ের কথা, বাদ যায় না ভবিষ্যৎও। প্রত্নকথা, আদিকল্প, কিংবদন্তি, ধ্রুপদী সাহিত্য, কল্পনা, প্রতীক সব গ্রন্থিত হয়ে যায় উপন্যাসটির কোষে কোষে। উপন্যাসটির প্রচ্ছদপটে আভাস দেওয়া হয় খণ্ডসময় ও মহাসময়ের এই দ্বিরালাপ সম্বন্ধে —

> 'কপিলাবস্তুর রাজপুত্রের মহানিষ্ক্রমণের পর শূন্যপৃষ্ঠ ঘোড়া কন্থক আর শূন্য হৃদয় সারথী ছন্দক পাশাপাশি বেঁচেছিল এতকাল। বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে ঘোড়াটি নিরুদ্দেশে গেল সারথীকে ফেলে। সারথী সেই ঘোড়াকে খুঁজতে খুঁজতে চলে যায় কিংবদন্তীর জাহাজঘাটা থেকে রকেট উৎক্ষেপন কেন্দ্রে, সেখান থেকে সুবর্ণরেখা আর বঙ্গোপসাগরের মিলনস্থলে জেগে ওঠা চরভূমিতে যেখানে

> পলাতক ঘোড়ারা যায় স্বপ্নতাড়িত হয়ে। শূন্যপৃষ্ঠ সেই অশ্ব যেন অশ্বমেধের ঘোড়া, তাকে অনুসরণ করছে নিঃশব্দ হত্যাকারী, নিশ্চুপে। নিরুদ্দিষ্ট সেই ঘোড়া অতিক্রম করে ভারতবর্ষ, তেজষ্ক্রিয় বাতাসে ঢাকা মরুপ্রান্তর, নদীতীর, অরণ্য, পাহাড়। 'অশ্বচরিত' সেই বিরল গোত্রের ধ্রুপদী উপন্যাস যার চালচিত্র সমকালীন এই ভারতবর্ষ। এই উপন্যাস জীবন এবং মৃত্যুর। প্রেমের এবং অপ্রেমের। অমর মিত্র তাঁর উপন্যাসে সমকালের কথা বলেন, চিরকালের কথা বলেন। এই উপন্যাসে বিপন্ন এই উপমহাদেশ তার ছায়া ফেলেছে দীর্ঘ।'[৫]

তিনশ বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠার এই বিশালাকার উপন্যাসটির বীজ ১৯৮২ সালে লিখিত আরেকটি উপন্যাসে রয়ে গেছে। 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় 'বিভ্রম' নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল, যার বিষয়বস্তু ছিল সমদ্রতীর আর একটি নিরুদ্দিষ্ট ঘোড়া। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন যে কর্মসূত্রে দীঘায় প্রায় একবছর ১৯৮০ সালে তাঁকে থাকতে হয়। সেই সময় যে হোটেলে তিনি ছিলেন সেই হোটেলওয়ালার ঘোড়া হারিয়ে যায়। ভানুদাম নামের একটি লোক সেই ঘোড়ার খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল, লেখক নিজেও মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তেন। কিন্তু 'বিভ্রম'কে নিয়ে আখ্যানকারের একটু দ্বিধা ছিল, তাই দীর্ঘদিন উপন্যাসটি দুই মলাটের ভিতর প্রকাশের অপেক্ষায় রয়ে যায়। হয়তো এভাবেই রয়ে যেত। কিন্তু ১৯৯৮ সালে ঘটে একটা বড় ঘটনা। ঘটনাটি ছিল বুদ্ধ পূর্ণিমার রাতে পোখরানে পরমাণু বোমার সফল পরীক্ষা এবং সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণপন্থী গোঁড়া জাতীয়বাদ উস্‌কে দেওয়ার চেষ্টা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ নিজেদে স্বার্থে। লেখককে এ ঘটনা নাড়া দিয়েছিল প্রচণ্ড। এই ঘটনা 'বিভ্রম'কে কীভাবে 'অশ্বচরিত' -এ পরিণত করল — তা জানিয়েছেন লেখক এভাবে —

> 'বিভ্রম' নিয়ে আমি নিজেই বিভ্রমে ছিলাম তাই এটিকে দুই মলাটে আনতে পারিনি। ... আমি মাঝে মধ্যে ছাপা অংশটি নেড়েচেড়ে দেখতাম। কীভাবে লেখাটি সম্পূর্ণ করে তোলা যায়। ১৯৯৮-এ পরমাণু বিস্ফোরণ হয়। ভারত এবং পাকিস্থান দুই দেশের রাষ্ট্রনায়করা খেলনার মতো পাঁচটি আর সাতটি পরমাণু বোমা ফাটিয়ে নিজেদের জাহির করলেন। যেন এ পাড়ার মাস্তান পাঁচটি বোমা ফেলল। মাস্‌ল দেখাল, ওপাড়ার মস্তান তা দেখে সাতটি বোমা ফাটিয়ে মাস্‌ল দেখাল। 'অশ্বচরিত' লেখা শুরু করি সেই মে মাসে।'[৬]

আঠারো বছর আগের সেই পলাতক ঘোড়ার সঙ্গে মিশে গেল সমসাময়িক ঘটনা, আর তাকে লেখক উপস্থাপিত করলেন মহাসময়ের কাঠামোতে। সেই সময় 'ধ্রুবপুত্র' লেখার জন্যে সংস্কৃত সাহিত্যের

অধ্যয়ন করছিলেন কথাকার। অশ্বঘোষের ‘বুদ্ধচরিত’ থেকে রাজকুমার গৌতমের ঘোড়া কন্থক আর সারথী ছন্দক চলে এল আখ্যানে। বাস্তব ও পরাবাস্তব মিশে গিয়ে সময় ও পরিসরের সীমানা, ভূগোল ও ইতিহাসের কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে দিল। বাস্তবের নির্দিষ্ট পরিসর ভেঙে দিল ইন্দ্রজাল —

> ‘ছিল পক্ষিরাজ, হয়ে গেল কন্থক। ছিল ভানুচরণ; ভানুদাস হয়ে গেল ছন্দক।’
> (পৃ. ১/ অশ্বচরিত)[৭]

তিন

ঔপন্যাসিক কেবলমাত্র যথাপ্রাপ্ত সময়ের লিপিকার নন। তাঁর কাজ সময় যেভাবে সাধারণ মানুষের সামনে প্রতীয়মান হচ্ছে তাকে লিপিবদ্ধ করাও নয়। ঔপন্যাসিক আমাদের দেখিয়ে দেন সময় ও সমাজের সেই দিকটা, যা আমরা দেখিনি বা দেখলেও সেই দেখায় রয়েছে একদেশদর্শিতার ভুল। যেহেতু, অনেক ক্ষেত্রেই প্রতাপ, বিশ্বপুঁজিবাদ নিজেদের সুবিধার্থে ছদ্মসত্য তৈরি করে, ফলে অনেকক্ষেত্রেই সেই ছদ্মমায়ার ভুলে থাকার সম্ভাবনা রয়ে যায়। দ্রষ্টাচক্ষু সম্পন্ন সৎঔপন্যাসিকের কাজ সময়ের মধ্যে থাকা ইতি ও নেতি পাঠকের সামনে তোলে ধরা। মুখ থেকে বিজ্ঞাপনের মুখোশ খুলে দেওয়া। অমর মিত্র একজন যথার্থ ঔপন্যাসিক হিসেবে তাই করেন। জীবন যে বহু বিপ্রতীপের আশ্চর্য সমাহার তা জানান তিনি তাঁর পাঠকদের। হোটেলওয়ালা শ্রীপতি মাইতির নিরুদ্দিষ্ট ঘোড়ার অনুসন্ধানের প্রয়াসে আবিষ্কৃত হতে থাকে জীবনের নানা দিক, উদ্ঘাটিত হতে থাকে সময়ের নানা বিভঙ্গ।

বন্ধ হয়ে যাওয়া পাটকলের শ্রমিক, ঘোড়াটির তত্ত্বাবধায়ক ভানুদাস ঘোড়াটির খোঁজে ঘুরতে থাকে নানা জায়গা, সেই জায়গার মানুষগুলো উঠে আসে আখ্যানে এই অনুসন্ধানের সূত্রে, উঠে আসে নানা তথ্য। ভানুদাস যে ছিল নিতান্তই এক জুটমিলের শ্রমিক, সে নানা মানুষের জীবন দেখতে দেখতে আর সেই তথ্যগুলোকে জুড়তে জুড়তে যেন হয়ে ওঠে দার্শনিক। সে নিজেকে বলে ছন্দক আর শ্রীপতি মাইতির ঘোড়াটিকে বলে কন্থক। তার কল্পনার সূত্রে আখ্যানে গ্রথিত হয় সেই মহামানবের কথা যিনি আড়াই হাজার বছর আগে সর্বমানবের চিরশান্তি, চির আনন্দের পথ সন্ধান করার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করেছিলেন পরিবার-পরিজন,সিংহাসন-রাজ্য। ‘অশ্বচরিত’ শুরু হয়েছে ‘বুদ্ধচরিত’ এর অষ্টমস্বর্গের চতুর্দশ শ্লোকটি দিয়ে। কুমার ফিরে এসেছেন ভেবে সব নারীরা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শূন্য পৃষ্ঠ ঘোড়াকে ফিরে আসতে দেখে জানালা বন্ধ করে বিলাপ করতে লাগল। এই অর্থ-সম্বলিত শ্লোকটি

'অশ্বচরিত' -এর প্রারম্ভে ব্যবহৃত হলেও, তা আখ্যানভাগ থেকে আলাদাই রয়ে যেত যদি না ভানুদাসের মাধ্যমে তা তৎকালীন সময়োপযোগীভাবে ব্যবহৃত হত। লেখক বিষয়টিকে বিস্তৃত করে জানান —

> 'ভানুচরন নিজের পরিচয় দেয় ছন্দক বলে, বলে বেড়ায় হারানো ঘোড়াটি ছিল কন্থক। ... উপন্যাসে সে একটি বন্ধ কারখানার শ্রমিক। ... আসলে ভানুদাসের স্মৃতি এই সভ্যতার স্মৃতি। তার বয়স আড়াই হাজার বছর। সে যেন বৃদ্ধ প্রপিতামহ। আরও পূর্ব পুরুষের কেউ। এ উপন্যাসে প্রাচীন ভারত এসেছে ভানুদাসের স্মৃতিতে।'[৮]

কিন্তু এ আখ্যান কেবল স্মৃতির আখ্যান হয়েও থাকে না, মহাসময়ের স্রোতে খণ্ডসময়ের উপখণ্ডটিকে ধৌত করে। বুদ্ধের প্রসঙ্গ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে যখন পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ হয় বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে। আর রাষ্ট্রপ্রভুরা পরমাণু প্রকল্পের সাফল্যতে চিহ্নিত করে Buddha Smiles বলে। যে মহামান্য মৃত্যুর অন্ত খুঁজতে চেয়েছিলেন, তাঁর জন্ম ও নির্বাণ লাভের দিন এবং তার নাম ব্যবহৃত হয় মারণ যজ্ঞের পরীক্ষণের দিন ও নাম হিসেবে। পক্ষীরাজ কন্থকও পালায় সেদিন। ভানু তার দীর্ঘ মানস ও ভৌগলিক যাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে বলে যায় —

> 'বলতে বলতে আচমকা থামে, থেমে যেতে তার কণ্ঠ হতে জেগে ওঠে অন্য আর এক স্বর। আসলে কন্থক তা জানতো মৃত্যুকে জয় করতে বেরিয়েছেন কুমার, রাজপুত্র মৃত্যুকে নিশ্শেষ করতে তাঁর অশ্বটিকে শূন্য পৃষ্ঠ করে রেখে গিয়েছিলেন, এখন মরণের ছায়া দেখে সে কি কুমারের সন্ধানে গেল, তা না হলে গেল কোথায়, এ মরণে কি কুমারেরও নিস্তার নেই?'[৯]

সত্যিই তো কুমারেরও নিস্তার নেই, তাই তো তাঁর নাম এভাবে ব্যবহৃত হয় দক্ষিণপন্থী ক্ষমতাসীন প্রভুদের হাতে। ছড়িয়ে পড়তে থাকে যুদ্ধের বাতাবরণ। ছড়িয়ে দেওয়া হয় সাম্প্রদায়িকতার বিষ।

ভারতবর্ষে গণতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল এক কল্যাণকামী রাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্যে। স্বাধীনতালাভ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই এক ক্রান্তদর্শী কবি লিখেছিলেন —

> 'কিন্তু সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ।
> চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধভিড় — অলীক প্রয়াণ।
> মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর;
> যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল;

মানুষের লালসার শেষ নেই;'[১০]

অনেক বছর পেরিয়ে গিয়েও এই অবস্থার খুব পরিবর্তন হয়নি। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অশিক্ষা, শিশুমৃত্যু, শিশুশ্রম কোনটিই এখন পর্যন্ত দেশ থেকে সম্পূর্ণ দূরীকরণ সম্ভব হয়নি। লঙ্কায় গেলে যেমন সবাই রাবণ হয়ে যায়, তেমনি যেন যেই ক্ষমতায় বসছে সেই নিজের আখের গুছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে, দেশের আপামর জনসাধারণের কথা ভাবার সময় তাদের কোথায়। একদিকে জীবন যাপনের অহেতুক কুহকী আমোদের আয়োজন, অন্যদিকে শোষণ দেখে বিশিষ্ট ফরাসী তাত্ত্বিক জাঁ বদ্রিলার তাঁর 'Cool Memories' এ লিখেছিলেন —

> 'Anyway we are condemned to social coma, political coma, historical coma. We are condemned to an anaesthetized disappearance, to a fading away under anaesthesia.[১১]

এই উচ্চারণ নব্বই-এর দশকের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যথাযথ। ইতিহাস গ্লু বিছানায় মৃতপ্রায় মুগ্ধা অন্তগ্লসত্তার মতন' (পৃ. ৭৬৮/আকাশে রাত/ কাব্যসংগ্রহ)। আর ভোটবাক্স কায়েম রাখার জন্যে চলছে নানা রাজনৈতিক খেলা। একদিকে দেশীয় সংস্কৃতির ধ্বজা বহন করার নামে হচ্ছে স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ আর অন্যদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলির বেসরকারিকরণ আর বিদেশি লগ্নীকারীদের ডেকে এনে পুঁজিবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা চলছে। আবার পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিচিত্র সহাবস্থানকে আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ধর্মান্ধতা মৌলবাদের বিষ। যখন সাধারণ মানুষ নিজেদের সমস্যা নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠতে শুরু করে তখনই কোনো না কোনভাবে সেই সুস্থ আন্দোলনকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয়। হিটলার বলেছিলেন, 'Vehemence, passion, fanaticism these are great magnitude forces which alone attract the great masses.'[১২] প্রতাপ সেই প্রচণ্ডতা, আবেগ আর ধর্মীয় উন্মাদনাকে কাজে লাগায় মানুষের বোধকে দমিয়ে রাখার জন্যে। তাই কখনো সীমান্তে বেধে যাওয়া যুদ্ধ, কখনো পরমাণু বোমার পরীক্ষা আবার কখনো ভিন্নধর্মাবলম্বী দুই পক্ষকে সাম্প্রদায়িকতার সুড়সুড়ি দিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলে মানুষের দৃষ্টি জীবন সমস্যার থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। জাতীয়তাবাদের স্লোগান তোলে কী হতে পারে তাও তো আমাদের হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখিয়ে গেছেন হিটলার-মুসোলিনীর মতো ফ্যাসিস্টরা। তবু আমরা ভুল ফাঁদে পা দিই, কারণ —

Men are not wise when they hear the call of nationalism.'[১৩]

আর এ কথা তো জানাই, যে দুর্বলতম জায়গাকেই প্রতিপক্ষ নিজের সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহার করে। তাই কখনো কারগিল, কখনো বুদ্ধের হাসি আড়াল করে অশিক্ষা-অপুষ্টি-দারিদ্র্য-বেকারত্ব। সমস্যা আরো সঙ্গীন হয়ে পড়ে যখন এ সবের উপর চড়ানো হয় সাম্প্রদায়িক রঙ, যখন তৈরি হয় সহজ সমীকরণ পরমাণু বোমা পরীক্ষা = প্রতিবেশি (মুসলিম) দেশের বিরুদ্ধে শক্তিসঞ্চয় = দেশপ্রেম = হিন্দুত্বের পুররুত্থান = মুসলমান বিরোধিতা। এ সবের বিরুদ্ধে সচেতন বুদ্ধিজীবী হিসেবে অমর মিত্রের সাহিত্যিক প্রতিবাদ 'অশ্বচরিত'। তিনি জানান—

'যে দম্ভ প্রকাশ পেয়েছিল তখন, তার বিপরীতে যে দম্ভ দেখিয়েছে প্রতিবেশী দেশের শাসককুল, তাতে দুই দেশের সাধারণ মানুষ শঙ্কিত, ভীত। তারপর তো দীর্ঘস্থায়ী এক দাঙ্গায় এসে তার চেহারা আরো ভয়ানক হয়ে উঠল। দাঙ্গা নয়, এক সম্প্রদায়ের প্রতি সংখ্যাগুরুর ভীষণ হিংস্রতা প্রদর্শন। ফ্যাসিবাদ ক্রমশ ছেয়ে ফেলেছে আমার এই বাসভূমিকে। তার বিরুদ্ধেই তো কথা বলেছে 'অশ্বচরিত'।'[১৪]

এভাবে আখ্যানটিতে ছায়া ফেলে রাজনৈতিক সময়। আর তাই সমালোচক শুভময় মণ্ডল যখন 'অমর মিত্রের গদ্য ও গদ্যের দায়' প্রবন্ধে 'অশ্বচরিত'-কে রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করেন, তখন আমরা তা স্বীকার করেনিই। আমরা জানি প্রতিটি অনেকার্থদ্যোতক উপন্যাসেই রাজনৈতিক সময় কমবেশি তার ছাপ ফেলে। কিন্তু 'অশ্বচরিত' এ রাজনৈতিক সময় কেবল মাত্র তার ছায়া ফেলেছে বললেই বোধ হয় বলা সম্পূর্ণ হয় না। আখ্যানের মাধ্যমে সভ্যতার পক্ষে থাকা রাজনীতির হয়ে সভ্যতার বিপক্ষে থাকা রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়েন।

কন্থকের খোঁজে চলতে চলতে ভানু ওরফে ছন্দক দেখে সামরিক প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করছে সরকার মহাপাত্রপুর, দেপাল, কুসমাড় এর জমি। কিছু মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, জমি হারিয়েছে এমনকি প্রতিবাদ করার ফলে ইজ্জত হারিয়েছে। সুভদ্রা তেমনি একটি মানুষ, সে ভিটা, সংসার, ইজ্জত হারিয়ে ক্ষণিকের আশ্রয় পেয়েছে শ্রীপতি মাইতির খামারে নায়েব রামচন্দ্রের সহমর্মিতায়। ভানু ও রামচন্দ্রের সঙ্গে তার কথোপকথন হয়ে ওঠে গভীর রাজনৈতিক চেতনায় নিষ্ণাত—

'পোকল্প কী?

রামচন্দ্র বলে, আকাশে রকেট উড়ে, সেই রকেট ইখেন থেকে আকাশে উঠে।

সুভদ্রা বলে, রকেট না উড়লে কী হত?

ভানু বলে, সরকার চায় তাই উড়ে।

কেনে উড়ে, কিছুই ধরা যায় না?

ভানু বলল, সে বড় কঠিন ব্যাপার সুভদ্রা, শত্রু জব্দ করতে রকেট আকাশের উড়ে, উসব মিলিটারির বেপার।

মোদের সব গেল, মোরা তো ভারতের লক।

তা তো বটে। ভানু সমর্থন করে।

ভারতের লক, তবু মোদের ধান, পান, সব লিয়ে মোদের উচ্ছেদ করিছিলা।

ভানু বলল, ইরকম হয়।

কী হয়?

মানুষের জমি নেয় গরমেন।

কেনে নেয়? সুভদ্রা আচমকা চিৎকার করে ওঠে, কেনে নেয় কহ দেখি ভানুবাবু, আকাশ পুড়ানোয় মোদের কী লাভ?

ভানুআত্মরক্ষা করতে পারে না। সত্যি কেন নেয় সরকার? কী হয় এতে? ভানুর মনে হয় নিজে যেন সরকারের পক্ষে কথা বলছিল। পক্ষে তো কথা আছে। ওই রকেটে করে সরকার বোমা পাঠাবে শত্রুর দেশে। শত্রুর দেশ কোনটা? পাকিস্তান হবে। চীন হবে। ভারত ছাড়া সবই ভারতের শত্রু। তার মানে ভারতের লোক ছাড়া সবাই ভারতের লোকের শত্রুতা, কত শয়তানি! এই যে বসে আছে সুভদ্রা, একে নষ্ট করেছে কে? ধ্বংস করেছে কে? ঠিকাদারের লোক। সে কি অন্য দেশের লোক?'[১৫]

অত্যন্ত সচেতনভাবে কথাকার সেই সাধারণ সমীকরণটিকে যেন ভাঙতে চাইছেন যেখানে দেশপ্রেম থেকে পৌঁছে যায় সাম্প্রদায়িক বিরোধিতায় বা সামরিক শক্তিবৃদ্ধি মানে দেশ সমৃদ্ধ হওয়ার সহজ অঙ্ক কথা হয়। আর যে রাজনৈতিক চক্রান্ত এমন ভাবতে সাধারণ মানুষকে প্ররোচিত করে তার বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়ান তার শাণিত লেখনী নিয়ে।

চার

সত্তর পরবর্তী লেখকরা আখ্যানে কাহিনির বাঁধাধরা ছাঁচে নিজেদের রুদ্ধ রাখেন না যেমন, তেমনি একমাত্রিক আখ্যানও তাঁদের অন্বিষ্ট নয়। অমর মিত্র তার ব্যতিক্রম নন। 'অশ্বচরিত' উপন্যাসটিকে কেবল মাত্র রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে দেখালে আখ্যানটির অন্যান্য মাত্রা আমাদের নজর এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায়, যে নানা মানুষের জীবনচরিত্র অমর মিত্র এই আখ্যানে এনেছেন, তাদের সঙ্গেও তো জড়িয়ে আছে নানা জীবনসমস্যা, সমাজের বাস্তব মুখ ও মুখোশ আর সব মিলিয়ে সমকালীন ভারতবর্ষ। ভানু তার যাত্রা পথে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে কত অসংখ্য মানুষকে, তাদের ছোট বড়ো কাহিনি এসেছে আখ্যানে, আবার তারা হারিয়ে গেছে। শ্রীপতি মাইতি, ভারতী চৌধুরী, মধুমিতা মাইতি, কুন্তি, অনন্ত নুমারা, সরস্বতী, পঞ্চম ঠাকুর, প্রেম মদনানি, কোকিলা, গৌরমোহন, শিবরাম, ঊষা, ফ্রেদরিক, পরী, বেঙ্গা, রামচন্দ্র, সুভদ্রা, পাণ্ডবকুমার, নগেন গিরি, সতীশ গিরি, সুরেন কুণ্ডু, বিষ্ণুপদ পাতর-কতো মানুষ আর তাদের কাহিনি আর এই কাহিনিগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রতাপের চেহারা, অর্থের অসম বন্টনের কুফল, পুরুষতন্ত্রের বিপ্রতীপে প্রান্তিকায়িত নারীর অবস্থান। আর্থরাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা কীভাবে ব্যক্তি পরিসরকে দুমড়ে মুচড়ে দেয় তা এই জীবনগুলি অধ্যয়ন করলে আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়—

> 'এতে আছে নারী পুরুষের সম্পর্কে লীন কুহকী বাস্তবতা, আছে আর্থ রাজনৈতিক শোষণের প্রসঙ্গ, রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদের আভাস, সামাজিক সংকটের নানা ছবি, নিসর্গ সঞ্চারিত দার্শনিকতা, নৈতিক অবচেতনার অনুষঙ্গ এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, খণ্ড সময় ও মহাসময়ের দ্বিরালাপে বৃত্ত দার্শনিকতা।'[১৬]

গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি শর্ত হল বিচারব্যবস্থা, শাসন বিভাগ আর আইন প্রণয়কারী পরিষৎ একে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ না করে পরষ্পরের সহযোগিতায় স্ব স্ব কার্য সম্পন্ন করবে। কিন্তু ভারতবর্ষের জনগণের দুর্ভাগ্য হল এই দেশ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও গণতন্ত্রের সফলতার প্রাথমিক শর্তের অনেকগুলি এখানে যথাযথভাবে পালিত হয় না। ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গুলি নির্দেশে পুলিশ কাজ করে, কখনো বা অর্থবান ব্যক্তিদের নির্দেশে। আবার পুলিশের কুকর্মের সাজা ৯৯.৯৯% ক্ষেত্রেই হয় না। ফলে সাধারণ লোকের পক্ষে পুলিশ বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায় প্রায় ক্ষেত্রেই। সরকারী জমি অধিগ্রহণের সময় পুলিশি অত্যাচার কী ভয়ানক হতে পারে তা আমরা কিছুদিন আগেই প্রত্যক্ষ করেছি লালগড়ে। 'অশ্বচরিত' এ ওড়িশার বালিয়াপাল ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্যে জমি অধিগ্রহণের

এক নৃশংস চিত্র ফুটিয়ে তোলেছেন অমর মিত্র দেপাল গ্রামের কাহিনির মাধ্যমে, সুভদ্রার কাহিনির মাধ্যমে।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে মহাপাত্রপুর, দেপাল, কুসমাড়-এর জমি সরকারি প্রয়োজনে অধিগ্রহণের নোটিশ দেওয়া হয়। কিন্তু তখন যেসব জমির খানিকটা নিয়ে বাকিটা ভবিষ্যতে নেওয়ার অপেক্ষায় রয়ে যায়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সেখানকার বাসিন্দারা ভেবেছিল সরকার নেবে না জমি, কোনো কারণে পূর্বের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়েছে। কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর পর আবার নোটিশ পড়ল। যারা জমির ক্ষতিপূরণ আগে নেয়নি, তারা নিতে পারে ক্ষতিপূরণ তাও জানিয়ে দেওয়া হল। অথচ পঁয়ত্রিশ বছর আগে যে জমি বালিয়াড়ি, অনাবাদী জমি ছিল, তা কৃষি জমিতে পরিণত হয়েছে। এক কালের কেয়াবন আর বন্যগুল্মো ভর্তি জমিতে লাগানো হয়েছে ধান, পান, তরমুজ, চিনেবাদাম, নারকেল গাছ। তারা বেশ কয়েকবার সরকারি সেই খাস জমি লিজ নেওয়ার জন্যেও আবেদন করে, কিন্তু তা নামঞ্জুর হয়। রেভিনিউ অফিসার বলে, তাদের উচ্ছেদ যখন করা হচ্ছে না তখন লিজ নেওয়ার প্রয়োজন কী? কিন্তু যখন উচ্ছেদের নোটিশ এল, তখন আর সময় ছিল না। দেপালের লোক নিজেদের শ্রমের ফসল মাথা গোঁজার ঠাঁই বাঁচানোর জন্য সার্ভেয়ার দলকে তাদের কাজে বাধা দিল।

> ‘থানার পুলিশ চোখ রাঙিয়ে নারকেলের ফাঁদি ভেঙে তরমুজের ক্ষেত তছনছ করে, চিনেবাদাম ক্ষেত মাড়িয়ে দখল নিতে লাগল। জমি যখন সরকারের তখন জমির ফসলে তো সরকারী লোকের অধিকার। গ্রামের মানুষ লাঠি সোটা নিয়ে তাড়া করল সার্ভেয়রের দল আর পুলিশকে। পুলিশ সাময়িক পালালেও, রাত্রিতে সেজে গুজে এল গ্রামে। বন্দুক উঁচিয়ে ঘরে ঘরে টর্চ মারতে লাগল। পছন্দ মতো মেয়েমানুষ খুঁজতে লাগল।.....পুলিশ জানত, পুরুষগুলো ভয় পেতে পারে তাদের ঘরের মেয়েদের বে-আব্রু করে দিলে। কিন্তু বে-আব্রু সত্যিই পুলিশ করেছিল কিনা মেয়েদের, ধষর্ণ করেছিল কিনা পুলিশ এবং কাঁটাতার বসানোর ঠিকেদারের মাস্তান বাহিনী সে কথা বলার মতো কেউ ছিল না। কোন মেয়ে তার লাঞ্ছনার কথা বলে? বলে না, বলতে পারে না বলেই তো ধর্ষণ, লাঞ্ছনাই পুলিশের হাতের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র।’[১৭]

মেয়েদের তো বলাই হয় বুক ফাটে তবু মুখ ফোটেনা’ আর তার উপর ধর্ষিত মেয়েদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নেই বলেই মেয়েরা লাঞ্ছনা সহ্য করে যায়। তবু সুভদ্রার মতো দু’একজন মুখ খোলে। কিন্তু যেখানে দুষ্কৃতীকারীরা স্বয়ং পুলিশের লোক বা তাদের মদতপুষ্ট তখন বিচার কোথায়? মানবাধিকার সমিতির প্রচেষ্টার পরেও অর্থের হাতে বিকিয়ে যাওয়া স্বামীর অসহযোগিতা এবং ষড়যন্ত্রে দোষী তো শাস্তি পেলেই

না, উপরন্তু এবার দফায় দফায় চলে তার উপর ধর্ষণ।

> '...শেষবার পুলুশে, থানায়।...পুলুশ কহিছিলা, যদি ফের শোরগোল তুলে সুভদ্রা, আবার উহাকে নষ্ট করিবে উহারা, তখন সুভদ্রা চুপ করি রহিলা।'[১৮]

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যেখানে জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের সরকার, সেখানে সরকারি কাজের জন্যে গৃহহীন হয় কত মানুষ, ধর্ষিত হয় কত নারী তার হিসেব কে রাখে? কখনো সামরিক প্রয়োজনে, কখনো বড়ো কারখানা খোলার জন্যে, তো কখনো নদী বাঁধ তৈরির নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকার জমি অধিগ্রহণ করে আর নেপথ্যের কাহিনি, অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কমবেশি এই-ই। পুলিশি অত্যাচারের ধরনও মূলত এই-ই। যে কোনো প্রতিবাদী কণ্ঠকে চুপ করানোর জন্যে পুলিশের সাধারণ উপায় হল, নারী হলে ধর্ষণ আর পুরুষ হল বেধড়ক মার। প্রায় সময়ই রক্ষক ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অমর মিত্র এই বিষয়টিকে আরো বিস্তৃত করেছেন ২০০১ সালে প্রকাশিত 'নিরুদ্দিষ্টের উপাখ্যান' উপন্যাসে। পুলিশি অত্যাচারের কালো অধ্যায় ছাড়াও দেপাল, বালি মুণ্ডার জমি অধিগ্রহণের কাহিনিতে আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, যে দেশের অর্ধেক-এর চেয়েও বেশি মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে, এক বৃহৎ সংখ্যাক লোক দুবেলা পেট পুরে খেতে পায় না সেখানে জমির ফসল দুপায়ে মাড়িয়ে তছনছ করে দেওয়া হয় সামরিক অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে।

পাঁচ

> 'লবণ মানে শ্রম। সারাদিন রোদে পুড়ে পুড়ে সমুদ্রের লবণ বার করে আনা, সেই লবণের সঙ্গে নিজের দেহের লবণও মিশিয়ে দিতে হবে। কথায় বলে, নুন না দিলি নুন পাবিনি।
>
> নুন দেয়া। মানে শ্রম দেয়া। কপালের ঘাম পায়ে ফেলে ফেলে বিন্দু বিন্দু ধবধবে স্ফটিকের সন্ধান করা।'[১৯] (পৃ.৮)

অনন্ত সার সপরিবারে এভাবে রোজ শরীরের নুন ঝরিয়ে সমুদ্রের জল থেকে নুন উদ্ধার করে। করে আরো অনেকে। কিন্তু এতো শ্রমের বিনিময়েও ভরপেট খাবার জুটে না। এ কেবল মাত্র কোনো একজনের

কথা নয়, ভারতবর্ষের কোটি কোটি দিন এনে দিন খাওয়া মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি এই। ভারতবর্ষে উন্নয়নের নামে একদিকে ঝকঝকে শপিং মল, রেস্তোরাঁ, ফ্লাই ওভার হচ্ছে। আর অন্যদিকে ফুটপাতে ভিখিরির সংখ্যাবৃদ্ধি ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে পথ শিশুর খাদ্য অন্বেষণ, ক্ষুধার জ্বালায় কৃষকের আত্মহত্যা সবই ঘটছে চোখের সামনে। এ কথা হয়তো মিথ্যা নয় যে, দেশের অনগ্রসর , নিম্নবর্গীয়, ভূমিহীন চাষিদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে সরকার কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল কতটুকু হয়েছে এবং হচ্ছে তার সম্বন্ধে প্রশ্ন চিহ্ন রয়েই যায়। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতায় থাকার ফলে কিছুটা হলেও জমির সমবন্টনের কথা ভাবা হয়। অপারেশন বর্গার মাধ্যমে জমি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে অনেক রদবদল হয়। ভাগচাষী ও জমির মালিকের মধ্যে ফসলের ভাগ বাটোয়ারার হিসেব সরকার নির্ধারিত করে দেয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আশেপাশে থাকা রাজ্যগুলিতে এই উন্নয়নের ছোঁয়া পৌঁছায়নি। ওড়িশার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের ছবি অমর মিত্রের ভাষায়—

> ‘ঈশ্বরপুরে চাষাবাড়িতে ...ধান উঠত মৌসির মাস, আঘুনে...। বিঘায় দশ মণ হলে ছ’মণ বাবু, চার মণ চাষা। ও জায়গা এ জায়গার মতো নয় যে চাষা ধান বেশি নেবে আর মালিক পাবে কম, চাষা নেবে বারো আনা, মালিক চার আনা। ও জায়গায় যদি বাবু বলত নেবে পনের আনা, চাষা নেবে এক আনা, তবে তাই হতো।’[২০]

এক জমি বারবার চাষ করলে একধরনের অধিকার বোধ জন্মাতে পারে চাষিদের মধ্যে, তাই জমির মালিকেরা প্রত্যেক বছর চাষা বদলে দেয় জমির। যারা নিজেদের রক্ত জল করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলায় তাদেরই ফসলে ভাগ কম, জমির মালিকানা তাদের নেই, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে যেমন আইন আছে তেমনি আইনের ফাঁক ফোকরও আছে। অনন্ত যে জনৈক জমিদারের মুনিষ ছিল, সে বর্গার নাম লেখাতে পারে, এই সন্দেহে জমিদার তাকে বিদেয় করে দেন। সে প্রতিবাদ করে না, আইনি সাহায্য নেওয়ারও চেষ্টাও করে না। দীর্ঘদিন ধরে সামন্ততন্ত্রের বুলি তার মাথায় বাসা করে আছে। সে জানে—

> ‘বাঁধা মুনিষ ভাগ লেখায় না। লেখানো ঠিক না ওসব চিন্তা মাথায় ঢুকলে অধম্মো হয়।’[২১]

অনন্ত যদি পুলিশ বা বিচার ব্যবস্থার দ্বারস্থ হত তবেও বা কতটুকু কাজ হত তা বলা যায় না। যাই হোক, সে চাষের কাজ ছেড়ে চলে এসেছে। তার বাপ ঠাকুরদা নুন মারত, জমি চষত। অনন্ত এখন কেবল নুনমারা আর ট্যুরিস্ট ধরে হোটেলে দিতে পারলে বকশিস পায়। এভাবে ভালোভাবে চলা যায় না। তাই হোটেলের রাধুঁনি ঠাকুর পঞ্চম যখন মেয়ে কুন্তির কাজের খবর আনে—তখন সে সহজেই রাজি হয়। তারপর যখন সে

বুঝতে পারে কাজে দেওয়ার নামে মেয়েকে সে বিক্রি করতে চলেছে তখনও সে পিছিয়ে আসে না। মা সরস্বতী মেয়ে হারানোর দুঃখে কাঁদে, দুঃখ অনন্তরও কিছু কম হয় না সন্তান বিয়োগে। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত সান্ত্বনা পায়, তাদের শোক স্তিমিত হয় সেই সন্তান বিক্রির টাকার উমেই। এমনকী আবার সন্তানের জন্ম দিতে প্রস্তুত হয় সরস্বতী। কিন্তু এও তো সত্য আর্থিক অনটনই অনন্তকে বাধ্য করেছে এভাবে নিজের সন্তনকে অন্যের হাতে অর্থের বিনিময়ে তোলে দিতে।

ছয়

ভরতবর্ষের মতো মিশ্র অর্থনীতির দেশে সামন্ততান্ত্রিকতার সংস্কৃতি যে লুপ্ত হয়নি, তারই ঔপন্যাসিক রূপায়ণ শ্রীপতি মাইতির মতো চরিত্রে। শ্রীনাথ জানা নামক দীঘার এক হোটেলওয়ালা যে জমির টাকা হোটেল এর ব্যবসায় খাটাচ্ছিল, তারই নবনির্মাণ শ্রীপতি মাইতি হিসেবে। তারই ঘোড়া হারিয়েছে, কিন্তু ভানুর শোকের সঙ্গে তার মন কষ্টের কোনো তুলনাই হয় না। তার দুঃখ এটুকুই যে এই ঘোড়ার পূর্বপুরুষ ব্যবহৃত হত তার বাপ ঠাকুরদার হাতে। সে ঘোড়া খুঁজতে ভানুকে পাঠায় এই ভেবে যে পাওয়া গেলে ভালো, আর না পাওয়া গেলে মানুষ জানবে তার একটা ঘোড়া ছিল। সামন্ততান্ত্রিক প্রভু হিসেবে শ্রীপতির এতোই ক্ষমতা যে সে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন। অধীনস্ত কর্মচারী রামচন্দ্র শ্রীপতির অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতেও অপারগ—'বিয়ে? হয় নাই, বাবু কহিলে তো হিবে' (পৃ.৮১)। সামন্ততন্ত্রে জমিদাররা যে নিজেদের হর্তাকর্তাবিধাতা ভেবে নিতেন তা তো জানাই আছে। অনন্ত নুনমারা যখন শতপথী বাবুর মুনিষ ছিল, তখন অপেক্ষা করছিল কখন বাবু বিয়ে দেওয়াবে।

আবার সামন্ততন্ত্রের গর্ভেই জন্ম নেয় পুঁজিবাদ। শ্রীপতি চাষের জমি বিক্রি করে হোটেল করে দীঘায়। এই দু'ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাতেই মালিকের সঙ্গে জমি বা কর্মচারীর কোনো সরাসরি সম্পর্ক থাকে না, সম্পর্ক থাকে প্রয়োজনের — টাকার শ্রীপতি। তাই নায়েব রামচন্দ্রের সুখ দুঃখের পরোয়া করে না। বিষ্ণুপদ পাতর বা তার মৃত ভাইয়ের সংসার চলছে কি চলছে না—তাতে তার যায় আসে না। আর জমি কেবল টাকা আর ফুর্তির উৎস। তার ভাবনায়—

> 'জমি এখনো বহুকাল থাকবে। রাখবে শ্রীপতি।......দেশ থেকে যদি জমির মালিক চলে যায়, তবে সে দেশের থাকে কী? জমি না থাকলে মানুষেরই বা থাকে কী?

মান-সম্মান সবই তো জমি দেয়। জমিই টাকা দেয়। হোটেল দিয়েছে শ্রীপতি মাইতিকে। জমি যত ইচ্ছে ফুর্তি দেয়।'[২২]

যদিও সে ভাবে জমি না থাকলে মানুষেরই বা থাকে কী কিন্তু এই ভাবার মধ্যে কোনো ভালোবাসা নেই মাটির প্রতি। টাকা পেলেই হল। যারা শ্রম দেয় জমিতে তাদের একই প্রশ্নে যে আর্তি তা শ্রীপতির ভাবনায় নেই। সামরিক কারণে জমি অধিগ্রহণের কথা উঠলে রামচন্দ্র বলে—

'টঙ্কায় কী হিবে, জমিন, ভুঁই না থাকিলে তো চাষা থাকেনি, চাষা না থাকিলে কী থাকে বাবুর? কাছারিও তো রহিবেনি।'[২৩]

শ্রীপতির কোনো অস্তিত্ব সংকট নেই জমি থাকা বা না থাকায়। তাই জমি অধিগ্রহণের খবর তাকে বিচলিত করে না। জমি গেলে টাকা আসবে। জমির ক্ষতিপূরণের টাকা তো আসবেই উপরন্তু সে চেষ্টা করে দশ সাল ফসলের ক্ষতিপূরণের টাকার বড়ো অংশ কীভাবে আত্মসাৎ করা যায়। অন্যদিকে জমি অধিগ্রহণ তার কাছে সুসংবাদ, কারণ আর খুব বেশিদিন এভাবে চলত না—অদূর ভবিষ্যতে কৃষকদের মধ্যে এই জমি বিলি বন্টন হয়ে যাওয়টার সম্ভাবনা ছিল। চাষাদের কী হবে তা শ্রীপতির কাছে 'ফালতু কথা'—

'জমিন নিয়ে নেমেছে জগতে, সুতরাং জমিন থাকলে কী হয়, জমিন চলে গেলে কী হয় তা জানবে কী করে শ্রীপতি? জেনেই বা করবে কী? কম টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে? তাতে কোন মেয়েমানুষ ধর্ষিতা হল, লাইনে গেল, গলায় দড়ি দিয়ে মলো সে খোঁজ রাখবে কেন সে?'[২৪]

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নারীর কেবল ভোগ্যবস্তু মনোরঞ্জনের উপকরণ মাত্র। সন্তানের জন্যে স্ত্রী আর এছাড়া ভোগ্যবস্তু হিসেবে থাকবে আরো নারী। মস্তিষ্ক, হৃদয় এ সমস্ত বাহুল্য, দেহই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মূল। শ্রীপতি এই চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। স্ত্রী মধুমিতা থাকা সত্ত্বেও নার্স ভারতী চৌধুরীর সঙ্গে শ্রীপতির সম্পর্ক আছে। ভারতী চায় আশ্রয়, ভালোবাসা—যা সে তার অনাথ জীবনে কখনো পায়নি। শ্রীপতির অভিনয়কে সে সত্য ভেবেছিল, তাই পরে তার পরিণতি অর্ধোন্মাদে রূপান্তরিত হওয়া। আর শ্রীপতি জামা কাপড়ের মতোই নারী পাল্টাতে পছন্দ করে। এক নারীতে যে দীর্ঘদিন সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তাই ভারতীর বিদায়ের ব্যবস্থা পরোক্ষ সেই করে। আবার কোকিলা আর সুভদ্রাকে দেখে সে মুগ্ধ হয়। কুন্তীর দুর্ভাগ্যের কথা জানতে পারলে তার মনোভাব হল—

'অনন্ত সারের মেয়েটা যে বিক্রি হয়ে গেছে সে খবরটা জেনেও চেপেছিল ভানু। শ্রীপতি কি বিশ পঁচিশ হাজার খরচ করতে পারত না। মেয়েটা বাইরে চলে গেল?'[২৫]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শেখানো বুলি আর মগজ ধোলাই মেয়েদের দেখার চোখ, বোধবুদ্ধি কেমন করে আবিল করে তোলে, তার প্রমাণ মধুমিতা। সে বলে—

> ‘পুরুষ মানুষ খেয়ালে মেয়েমানুষ পুষুক, তা পুষতে পারে, সেটা ভয়ের নয় ডাক্তারবাবু, ওখেনে মন মজে না, ফুর্তি হয়, কিন্তু মেয়েমানুষ যদি পুরুষ রাখে, সে পুরুষের আর বেরোবার উপায় নেই......।’[২৬]

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যেমন শ্রমজীবী মানুষের জীবন অনিশ্চিত তেমনি পুঁজিবাদ ও যন্ত্রসভ্যতার বাড় বাড়ন্তের ফলেও শ্রমজীবী মানুষের জীবনে নেমে এসেছে অনিশ্চিয়তা। ছোট খাটো কারখানা আর লাভজনক থাকছে না। সেগুলো বন্ধ করে তার মালিকেরা অন্য কোনো লাভজনক ব্যবসায় নেমে পড়ছে। এর ফলে মালিকদের কোনো ক্ষতিই হয় না, কর্মহীন হয়ে পড়ে সাধারণ শ্রমিকেরা। ভানুর মাধ্যমে আজকের সময়ের এই নির্মম সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে। বজবজের একটি পাটকলের সে শ্রমিক ছিল। কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে ভেঙে যায় তার সুখের সংসার। শিশু সন্তান ও স্ত্রীকে অনিশ্চয়তার পথে ছেড়ে দিয়ে তাকে ধরতে হয়েছিল অন্য পথ। সে দীঘায় আসে জীবিকার সন্ধানে, শ্রীপতির দাক্ষিণ্যে জুটে হোটেলের দালালি আর ঘোড়ার দেখভালের দায়িত্ব। কিন্তু তার পরিবারের খবর আর সে পায় না। ঘোড়া হারিয়ে গেলে সে আবার যায় বজবজ ঘোড়ার সন্ধানে। সেখানে গিয়ে সে দেখে ছোটখাটো সব কারখানাই বন্ধ হয়ে গেছে। আর সেসবের বদলে সেখানে মাথা তোলে দাঁড়িয়েছে মস্ত থার্মাল পাওয়ার স্টেশন। বিশাল এবং বদ্ধ এবং যন্ত্রনির্ভর। শিল্পায়নের নামে জীবিকা হারাচ্ছে শ্রমিকরা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। সমাজের ভেতরকার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে অঞ্চল জুড়া সবুজ বনানী। ‘কৃষ্ণগহ্বর’ উপন্যাসে অমর মিত্র আমাদের শুনিয়েছেন সেই ‘ছাই সমুদ্র’-এর কথা যা ঢেকে দিয়েছে সবুজ, ঢেকে দিয়েছে মানবিক পরিসর। ‘অশ্বচরিতে’ও আসে সেই কথা। খণ্ডসময়ের এই বাস্তবতার সঙ্গে লেখক মিশিয়ে দেন মহাসময়ের আকল্প থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা—

> ‘.....মানুষ যা করেছে সবেরই বিপক্ষে হয়ে যায় মানুষ।......এত যে কলকারখানা গড়ে মানুষ, তা কেউ দেখতে যায়? ......না যায় না, যায় সেই সমুদ্দুর, পাহাড়, জঙ্গল, মরুভূমিতে, যা ভগবানের দেয়া, নদী পর্যন্ত দেখতে আসে, কিন্তু কলকারখানা, শহর কিছুই দ্যাখে না, পালিয়ে আসে বিরক্ত হয়ে।’[২৭]

উঠে আসে নিবিড় উচ্চারণ—

> ‘মনে হয় কি জানো ভানুবাবু, যা দেখে শান্তি হয়, তাই-ই ভগবান।’[২৮]

সাত

যন্ত্রসভ্যতা একটু একটু করে মানুষকে পরিণত করে দিচ্ছে যন্ত্রে। মানুষের চেয়ে যন্ত্রই যেন বেশি প্রিয় কারণ তা বেশি লাভজনক। দুহাতে মানুষ নষ্ট করছে প্রকৃতি। তবু এই প্রকৃতির বুকেই সে শান্তি লাভ করে। আদিম মানুষের এই স্বভাব মানুষ এখনো পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি। তাই একদিকে সভ্যতা, উন্নয়নের দোহাই দিয়ে প্রকৃতিকে নষ্ট করে, অন্যদিকে ছুটে যায় আদিম প্রকৃতির সান্নিধ্য। কেবল মানুষ কেন গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে লুকিয়ে থাকে আদিম স্বভাব। শ্রীপতি মাইতির ঘোড়াটির মধ্যেও জেগে উঠেছিল তার আদিম স্বভাব। সে সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে ফিরে যেতে চেয়েছিল প্রাচীন যৌথ জীবনে, যেমনটা সে আগেও গেছে। অমর মিত্র তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা এরকম—

> ‘হোটেল মালিকের আসল সমস্যা ছিল এই টাট্টুটিকে নিয়ে। সে ছিল ভবঘুরে। পালিয়ে যেত লাগাম ছিঁড়ে। দীঘা চন্দনেশ্বর পেরিয়ে অনেক দূর, সেই একচরে, সুবর্ণরেখা যেখানে মিশেছে সমুদ্রে। চারা ঘাস খেতে আশপাশ থেকে আসত আরো। অনেক পলাতক ঘোড়া। কখনো চরে যেত, কখনো অন্য কোথাও, খোয়াড়ে আটকা পড়ত কারো জমিতে ঢুকে পড়ে।.....একরাতে ঘোড়াটিকে নিয়ে ফিরেও এল হোটেল মালিকের অ্যাসিসটান্ট, লাইসেন্স খোয়ানো ড্রাইভার। বেঁধে রাখল আমার ঘরের পাশের জমিতে। বর্ষাকাল, মেঘ আছে, চাঁদও আছে। পা ছুঁড়ছে টাট্টু। আমি জানালা খুলে দেখছি, সে হাঁ করে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। আবার পালাল শেষ রাতে। তার ভিতরে যেন অরণ্যচারী বুনো ঘোড়ার রক্ত জেগে উঠত মাঝে মধ্যে, বিশেষত প্রকৃতি যখন অবলীলায় রূপ বদলে ফেলে, তার দিকে তাকিয়ে। বাতাসে ঘ্রাণ নিয়ে সে যেন বহুপুরুষ আগের উদ্দামতা ফিরে পেত।’[২৯]

এইখানে অমর মিত্র উল্লেখ করেছেন জ্যাক লণ্ডনের ‘কল অব দ্য ওয়াইল্ড’ এর কথা। শ্লেজটানা কুকুরদের চাঁদের দিকে তাকিয়ে একসুরে ডাকার মধ্যে স্মৃতি রয়েছে পূর্বপুরুষের। আর স্বাধীনতা হারানোর যে দুঃখ রয়েছে তার উল্লেখ করেছেন অমর মিত্র। তবে জ্যাক লণ্ডনের সৃষ্ট অবিস্মরণীয় সারমেয় বাক-এর সঙ্গে অমর মিত্রের পক্ষীরাজের আরেকটা মিল আছে। বাক তার রক্তে পূর্বপুরুষের স্বাধীন শৌর্যের ডাক শুনতে পেত। বারবার সে গেছে আবার ফিরে এসেছে জন থর্নটনের ভালোবাসার টানে। পক্ষীরাজও গেছে পালিয়ে বারবার আবার ফিরে এসেছে বা আনা হয়েছে তাকে ফিরিয়ে। তবে শেষটায় বদলে গেছে

সব। জন থর্নটনের মৃত্যুর পর বাক বন্য প্রকৃতির টানে সাড়া দিয়ে সম্পূর্ণ বন্য জগতে ফিরে যায়। সেখানে সে নিজেকে বন্য নেকড়ের দলের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। বনেদি বাড়ির আদরে লালিত কুকুর বাক অবস্থার ফেরে উত্তর মেরুর সোনা সন্ধানী দলে যুক্ত হয়। ধীরে ধীরে আদিম প্রকৃতির পাঠশালায় সে শিখে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার কৌশল। আর শেষে শিরায় শিরায় পূর্বপুরুষের রক্তের নাচ তাকে অপ্রতিরোধ্য টানে ডেকে নিয়েছে উদ্দাম, অকরুণ প্রকৃতির বুকে। অন্যদিকে পক্ষীরাজ কন্থকের সামনে অপেক্ষা করছিল মনুষ্য সৃষ্ট মৃত্যুফাঁদ। তা থেকে বাঁচার কৌশল প্রকৃতি তাকে শেখায়নি আর মানুষও শেখায়নি। ফলে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে মৃত্যুর হাতে।

'অশ্বচরিত' মূলত অশ্ব অনুসন্ধানের কাহিনি। ধীরে ধীরে যখন জানাই হয়ে গেছে ঘোড়া পাওয়ার আর আশা নেই তবুও ভানু ছন্দক খুঁজে চলে কন্থককে। শেষ পর্যন্ত তো কেবল ঘোড়ার খোঁজের কাহিনি হয়েই রয়ে যায় না আখ্যানটি। বেরিয়ে আসতে থাকে ইতিহাস, প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। তবু খোঁজা শেষ হয় না। অন্বেষণ চলতেই থাকে। ছন্দক ভানুচরণের কাছে খোঁজাই হয়ে ওঠে বেঁচে থাকার পাথেয়। খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই মনে পড়ে যায় 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের কিছু সংলাপ—

> 'লেখক ।। পথ। আমাদের শুধু পথ আছে। আমরা হাঁটবো।.....ইন্দ্রজিৎ ।। দেবরাজ জুপিটারের অভিশাপে সিসিফাসের প্রেতাত্মা প্রকাণ্ড ভারি পাথরের চাঁই ঠেলে পাহাড়ের চূড়োয় তোলে। যেই চূড়োয় পৌঁছোয় আবার গাড়িয়ে নিচে পড়ে যায় পাথরটা। আবার ঠেলে ঠেলে তোলে। আবার পড়ে যায়, আবার তোলে।
>
> লেখক ।। আমরাও অভিশপ্ত সিসিফাসের প্রেতাত্মা। আমরাও জানি ও পাথর পড়ে যাবে। যখন ঠেলে ঠেলে তুলছি তখনই জানি এ ঠেলার কোনো মানে নেই। পাহাড়ের ওই চূড়োয় কোনো মানে নেই।
>
> ইন্দ্রজিৎ ।। তবু ঠেলতে হবে?
>
> লেখক ।। তবু ঠেলতে হবে। আমাদের আশা নেই, কারণ ভবিষ্যৎ আমাদের জানা। আমাদের অতীত ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে গেছে। আমরা জেনে গেছি—পেছনে যা ছিল সামনেও তাই।
>
> ইন্দ্রজিৎ ।। তবু বাঁচতে হবে?
>
> লেখক ।। তবু বাঁচতে হবে। তবু চলতে হবে। আমাদের তীর্থ নেই, শুধু যাত্রা আছে। তীর্থযাত্রা।'

আট

গন্তব্যে পৌঁছানো না গেলেও যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা জমতে থাকে। চলা যখন শুরু হয়েছিল তখন পাওয়ার আশা ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সে আশা কী ধরে রাখা যায়? ভানু হয় তো অনুমান করে পরিণতি কন্থকের, তবু বজায় থাকে তার চলা। কন্থকের খোঁজে চলতে চলতে প্রথম মীরগোদায় পৌঁছে ভানু কোকিলার বোনা মদরঞ্জির ঘোড়া দেখে রূপকথায় পৌঁছে যায়। যেখানে মন্ত্রবলে ঘোড়া বন্দি হয়েছে মদরঞ্জিতে। আবার হিনাড়ির গিরিমশায় তাকে শুনান রক্তে জেগে ওঠা পূর্বপুরুষের স্মৃতির কথা। কিন্তু ততদিনে ভানু জেনেছে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের কথা, বাতাসে ছড়িয়ে পড়া বিষের কথা। রাজকন্যার মন্ত্রে বন্দিত্বের রূপকথা ভেঙে গেছে। স্বাধীন আনন্দে অশ্ব যূথের ছুটে চলার প্রাগৈতিহাসিক ছবিকে সে মানুষের বিশ্ব গ্রামে কল্পনা করতে পারে না। তাই সে অনুমান করে—

> ‘পূর্ণিমার দিন বিকেলে পরপর তিনটি বোমা বিস্ফোরিত হয়ে ধরিত্রী গর্ভ ছিন্ন বিচ্ছন্ন করে দিল। ধরিত্রী গর্ভ থেকে তেজস্ক্রিয়তা উঠে বাতাসে কি ভাসেনি? ভেসেছিল। চাঁদের আলোয় কি মিশে যায়নি? গিয়েছিল। তা টের পেতেই ভয় পেল পক্ষিরাজ। তার রক্তের ভিতরে জেগে উঠতে লাগল সেই আদিম শিহরণ, যা বুনো ঘোড়ার দল পেয়েছিল কোন এক দূর অতীতের প্রত্যুষে। চোখের সামনে জেগে উঠল শিহরণ জাগানো, মরণের ভয় জাগানো সেই স্মৃতি। তখন কি আর সে থাকতে পারে? বনের দিকে, শান্ত নদীর দিকে, খোলা পৃথিবীর দিকে, লক্ষ বছরের আগের প্রকৃতির দিকে দৌড়ল সে।’[৩০]

কিন্তু লক্ষ বছরের আগে সেই পৃথিবী তো আর নেই, তাই এই বিষ থেকে বাঁচার উপায়ও নেই। ভানুর যুক্তিপরম্পরা তাকে পৌঁছে দিতে চায় ভবিতব্যে। কিন্তু তবু সে অস্বীকার করে যেন নিজেই নিজের কাছে। কিছুতেই ভাবতে চায় না যেন—তবু শেষ যে চিত্র তাও তো ছন্দকের সঙ্গে কন্থকের কথা থেকেই পৌঁছেছে। নাকি ছন্দকই পরিবর্তিত হচ্ছে কন্থকে। যেমনটা ‘অনুক্ষণ মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরি মাধব ভেল’, তেমনি হয়েছে কি? এ কী ছন্দকের অনুভবেরই কথা। লেখক তো ছন্দক আর কন্থকের কথায় খুব পৃথকীকরণ করেননি। ভানুই যেন হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যাচ্ছে চৌদ্দবেড়িয়া। তাকে সুন্দরী ঘুড়ী ডাকছে। সে পার হয়েছে বালিমুণ্ডা, হিনাড়ি, মীরগোদা, বজবজ ভোজপুর, দরিয়াপুর, দৌলতপুর। কীভাবে ভানুর যাত্রা কন্থকের যাত্রার সঙ্গে মিশে গেছে তা লেখকের ভাষায়—

> 'ভানু হাঁটছে। চৌদ্দবেড়িয়া...চৌদ্দবেড়িয়া...চৌদ্দবেড়িয়ায় আসে গিরিমশায়ের ঘুড়ীটি। রূপসী ঘুড়ী। বাদামী আর শাদায় মেশানো রঙ, কপালে পরপর তিনখানা শাদা টিপ। কীভাবে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায়। ফোঁসফোঁস করে। কীরকম চাহনি ফোটে রূপসীর দুই চোখে। দুই চোখ দিয়ে কীরকম ডাকে আমি চললাম। শরৎ কাল এসে গেছে। চললাম। নীল আকাশ, সাদা মেঘের ভেলা, জ্যোৎস্না, ঠাণ্ডা বাতাস—আমি চললাম।'[৩১]

বাস্তব থেকে এভাবে জেগে উঠেছে ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা। প্রথম অনুচ্ছেদে আমরা পেয়েছিলাম—'ছিল পক্ষিরাজ হয়ে গেল কন্থক। ছিল ভানুচরণ ভানুদাস হয়ে গেল ছন্দক'। আর শেষ অনুচ্ছেদে পৌঁছানোর ঠিক আগে কন্থক আর ছন্দক, ভানুচরণ আর পক্ষিরাজও যেন একাকার হয়ে গেল। আবার কখনো শ্রীপতির মনে হয় সফেন সমুদ্র ও সাদা পক্ষিরাজ এক। লাতিন আমেরিকার কথাসাহিত্যের ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভারতীয় তথা বাঙালিয়ানায় পরিবেশন করেন আখ্যানকার। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য এই উপন্যাসটিকে ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার বঙ্গীয় ভাষ্য বলে মন্তব্য করেছেন। (পৃ.১০৮ আখ্যানের স্বরান্তর)। বাস্তব যখন প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না, তখন কল্প জগৎ তৈরি করে মানুষ আশাহীন রিক্ততা থেকে বাঁচতে চায়। প্রতিদিনের ব্যবহৃত হতে হতে জীর্ণ বাস্তবের ঘেরাটোপ ভেঙে দিয়ে নির্মিত হয় তখন বাস্তবাতিযায়ী অপর-এর। এই জগৎ অলৌকিক অপ্রত্যাশিতের ভুবন, বুদ্ধি দিয়ে মেলে না তার ব্যাখ্যা। কিন্তু বাস্তব জগৎ যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন ঐন্দ্রজালিক বাস্তব সেই বাস্তব থেকে সম্পূর্ণ বিবিক্ত, স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না। বাস্তব তথ্যের জগৎকে নেতিবাচকভাবে উপস্থিত করে ঐন্দ্রজালিক বাস্তব। অর্থাৎ জাদু বাস্তবতার স্রষ্টারা কেবল প্রখর রৌদ্রালোকে নয়, জীবনের তাৎপর্য খোঁজেন ছায়াতেও, কিন্তু আলো না থাকলে ছায়া তৈরিই হবে না। যা ঘটছে বাস্তবে, তাকে অস্বীকার করেই সৃষ্টি হয় ঐন্দ্রজালিক বাস্তব, তৈরি হয় কুহক মায়া স্বপ্ন রহস্য।

'অশ্বচরিত' এও আখ্যানকার বাস্তবের ঊর্ধে এক অন্য জগৎ এর নির্মাণ করেন। ভানু যে ছিল অমর মিত্রের দেখা এক ভবঘুর স্বভাবের ব্যক্তি তাকে তিনি করে তোলেন মানুষের সম্পূর্ণ ইতিহাসের ধারক। সে কপিলাবস্তুর কুমার সিদ্ধার্থকে তপোবনে পৌঁছে দিয়ে ফিরেছিল শূন্যপৃষ্ঠ ঘোড়াকে নিয়ে। তারপর কত হাজার বছর কেটে গেছে তারা একসঙ্গে ছিল। কিন্তু ঘোড়াটা হারিয়ে গিয়ে সে যেন আবার ভবঘুরে হয়ে গেল। ঘোড়ার খোঁজে এবার সে পাড়ি দিতে চায় লক্ষ বছর উজানে। যেখানে তার কন্থকের পূর্বপুরুষেরা চরে বেড়াত। যদি ঘোড়াটার পূর্বপুরুষদের সনাক্ত করা যায় তবে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে ঘোড়ার। ভানুর কল্পনায় কুহকিনী কোকিলা ঘোড়াটাকে মদরঞ্জিতে বন্দি করেছে আবার কখনো সে মনে করে মদরঞ্জিওয়ালা,

কোকিলার স্বামী গৌরমোহনই পলাতক গোড়া। একটি পলাতক ঘোড়াকে নিয়ে তৈরি হয় কত কাহিনি। 'বর্ণহীন অশ্বের এত বর্ণ'—যে উপস্থিত নেই তাকে নিয়ে এতো কাহিনি! কিন্তু যে অনুপস্থিত তাকেই নিয়েই বোনা যায় কল্পনার জাল। অনন্ত সারের মেয়ে কুন্তি কখনো বর্ণহীন ঘোড়ার কথা বলে তো কখনো জাহাজের মালিক বুড়ো প্রেম মদনানিকে দেখিয়ে বলে 'সাদা ঘুড়া', 'ছিপতিবাবুর অশ্ব'। আবার তারপরে জাহাজওয়ালাকে দেখতে 'জাহাজের মতন লাগে' কুন্তির। আর ভানু বলে সিন্ধি লোকটা মহেঞ্জোদারো 'মৃতের শহর' থেকে উঠে এসেছে। কবর থেকে উঠে আসায় গায়ে গুমোট গন্ধ। সভ্যতার আদিমতম বৃত্তিকে যারা পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের গায়ে তো থাকবেই বাসি মড়ার গন্ধ। ভানু তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে তা টের পায়। যেমন সে বুঝে হাওয়া বিষের গন্ধ পেয়ে পালিয়েছে ঘোড়া। ভারতী নার্সও একটি নতুন কাহিনি তৈরি করে ঘোড়া পালানোর। ভালোবাসার পুরুষটি থাকতে চাইছে না তার কাছে, খুঁজে নিতে চাইছে অন্য কোনো নতুন নারীকে। এই অভিজ্ঞতা থেকে সে অনুমান করে ঘোড়াটাও আর পুরোনো মালিকে সন্তুষ্ট নয়, সে নতুন মালিকের সন্ধানে গেছে। বাস্তব-কুহক মিশে যায় বারবার। কুশীলবরা নিজেদের অন্য পরিচয় নিজেরাই খুঁজে নেয় যেন। ভানু যেমন নিজেকে বলে ছন্দক, তেমনি কাঁথি, দৌলতপুরের বাসিন্দা শিবরাম নিজেকে বলে নবকুমার আর কোকিলাকে বলে মৃন্ময়ী। নবকুমার প্রকৃতির ক্রোড়ে যে অপূর্ব নারী মূর্তি দেখেছিল শিবরাম তার কল্পনায় সেখানে দেখে কোকিলাকে। আবার কোকিলাকে ভানুর কখনো মনে হয় কুহকিনী আর কখনো মনে হয় 'এ মেয়ে যেন বর্ষার সেই মেঘই' (পৃ.২০৭)। বদলে যায় আমাদের পরিচিত পুরাণকথাও। ফরাসি শ্বেতাঙ্গ হিপি ফ্রেদরিক নিজেকে বলে কৃষ্ণ আর তার কৃষ্ণাঙ্গী প্রেমিকা জেলে বউকে সে বলে রাধা। সবই যেন ছিল রুমাল হয়ে গেল বেড়াল জাতীয় ঘটনা। এভাবে প্রসারিত হয় সত্তাও ও অপরতার দ্বিবাচনিক সম্পর্ক। নিয়মতান্ত্রিকতার নিগড়ে বাঁধা মানুষের স্বপ্ন, কল্পনা, উপলব্ধি পায় উড়ে বেড়ানোর জন্য খোলা আকাশ। আধিপত্যবাদের বাঁধন কাটানোর জন্যে ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা হয়ে ওঠে প্রধান আয়ুধ।

নয়

উপন্যাসটির পটভূমি মূলত দীঘা এবং সীমান্তবর্তী মেদিনীপুর ও ওড়িষা। কিন্তু এর মূল আধেয় ভারতবর্ষ। ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করে সহজেই আখ্যানের বিষয়বস্তু। তবে যে ভারতবর্ষের কথা তিনি বলতে চান সে ভারতবর্ষ শান্তির পূজারী, কিন্তু বাস্তব যে ভারত তাঁর সামনে সে হল পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন রণহুংকারে অভ্যস্ত। তিনি বাস্তব আর কল্পনা তাই মিলিয়ে দেন। তৈরি করেন এক জাদু বাস্তবতার

সাম্রাজ্য। প্রাতিষ্ঠানিক সত্য India shines এর পেছনে আসল বাস্তব তাঁর অন্বিষ্ট। নিম্নবর্গীয় চেতনায় নিষ্ণাত হয়ে অমর মিত্র খুঁজে নিয়ে আসেন চিরকালের অবহেলিত অনালোকিত বর্গকে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'আরণ্যক' উপন্যাসে ভানুমতী প্রশ্ন করেছিল ভারতবর্ষ কোন দিকে?' এই প্রশ্নের উত্তর যে স্বাধীনতা লাভের এতো বৎসর পরও মেলেনি তার প্রমাণ হিসেবেই যেন অমর মিত্র তোলে ধরেন এক বাস্তুচ্যুত রমণীর প্রশ্ন—'কী দেশ?' 'ভারত কী?' 'ভারত কত বড়?' এই আখ্যানে রাষ্ট্রীয় আধিপত্যবাদী প্রতাপের বিরুদ্ধে এক সোচ্চার প্রতিবাদ নিঃসন্দেহে। উন্নয়নের নামে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা অথবা মানুষের আর্থিক ভারসাম্য নষ্ট করার বিরুদ্ধে কথাশিল্পী অমর মিত্রের সোচ্চার প্রতিবাদ 'অশ্বচরিত'। পরমাণু বোমার মতো বিধ্বংসী অস্ত্র নিয়ে ছেলেখেলার বিপক্ষে যেমন শৈল্পিক প্রতিবাদ তেমনি রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী চরিত্রের বিরুদ্ধে কথা বলে এ, আখ্যান। সতীশ গিরির মতো চরিত্রের মাধ্যমে অমর মিত্র রাজনৈতিক সময়ের একটা চিত্র ফুটিয়ে তোলেন, যখন ক্ষমতাসীন দলের উসকানিতে দক্ষিণপন্থী উগ্র জাতীয়তাবাদ যুবসমাজকে গ্রাস করছে। ছড়িয়ে পড়ছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ। প্রাচীন ইতিহাসকে অস্বীকার করে যে ক্ষমতাসীন দল নিজস্ব নির্মিত ইতিহাস ছড়িয়ে দিচ্ছিল সবার মধ্যে তারই যেন প্রতিনিধি সতীশ। কিন্নর রায় 'বালিঘড়ি' নামক উপন্যাসটিতে দেখিয়েছেন কীভাবে একটু একটু করে বদলে দেওয়া হচ্ছে সত্য ইতিহাস। কাশী বারাণসী হিন্দুদের তীর্থস্থান, তাকে গড়ে তোলায় মুসলমান নবাবদের অবদান মৌলবাদীদের হজম হয় না, তাই ইতিহাস বদলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আসলেও তো তাই হচ্ছিল। স্কুলের ইতিহাসের বই বদলে যাচ্ছিল। বিবেকবান বুদ্ধিজীবীরা কী তা দেখে এবং বুঝেও অন্ধ সেজে বসে থাকতে পারেন! তাঁরা তো জানেন অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ হয় না। তাই তাঁরা তাদের সাহিত্য কৃতির মাধ্যমে চেষ্টা করেন জনসাধারণের সুপ্ত বোধ জাগ্রত করতে। স্থিতধী নগেন গিরির ছেলে অর্ধোন্মাদ সতীশ গিরি সংক্রামিত হয় সাম্প্রদায়িকতার বিষে। সে তার পিতাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে হত্যা করে নির্দোষ ঘুড়ীকে, যেটির গর্ভে কন্থক জন্ম দিয়েছিল সন্তান। সে বিশ্বাস করে, যুদ্ধ না হলে উপায় নেই, মানুষের মরা দরকার, মরণ চাই। সে বদলে দিতে চায় ইতিহাস। সে কন্থক আর নগেন গিরির ঘুড়ীর সন্তান ঘোটনের পূর্বপুরুষের দেহে কোন দেশের ঘোড়ার রক্ত খুঁজে না, সে বলে কোনো রূপকথার পক্ষীরাজের উত্তরপুরুষ ঘোটন। সে কন্থকের হারিয়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা দেয় তার মতো করে। অর্ধোন্মাদ সতীশ বলে—

> '...হা ভগবান, সিই ঘুড়ারে তুমি খুঁজি বেড়াচ্ছে, তুমি ধরতি পায়নি সি ঘুড়া কুথায় গেল, ইতো পস্কার ঘটনা, তুমার অশ্বের ডানা ফুটি গিইছে।'[৩২]

ঘোড়ার হত্যা যে কেবল একটি প্রাণীর নিধন নয়, তা কথাকার বারবার ইঙ্গিত করেছেন। সতীশ গিরি একবার বলেছে 'ইটা প্রতীকী'। আর তার পিতা নগেন গিরি কেবল বর্তমান নয়, অতীতের ছায়া দেখেন

এসব ঘটনার মধ্যে। তিনি বলেন—

> '...ইতিহাস যদি জানতে তুমি, টের পেতে কী হইছিলা একদিন, এতো ঘুড়ী মরিছে, দাঙ্গায় মানুষ কি কম মরিছে, আবার মানুষ মরার ইঙ্গিত হিলা ঘুড়ীটির মরণ, কতখানি রোষ, কতখানি হিংসা মাথার ভিতর ঢুকি গিইছে কহো দেখি, দিনাদিনা তা আরো বাড়বে ভানুবাবু, যত অভাব তত হিংসা, অভাবী মানুষের ভিতর হিংসা জাগানোর খেলা চলিছে।'[৩৩]

কিন্তু নগর পুড়লে তো দেবালয় রক্ষা পায় না। হিংসা, সাম্প্রদায়িকতার বিষ যারা ছড়িয়ে দিচ্ছে চারিদিকে, তারা যে সেই বিষ থেকে রক্ষা পাবে তাও তো হন। অমর মিত্র এই সহজ কথাটাই আবার আমাদের মনে করিয়ে দিতে চান—সতীশের অসুস্থতার মাধ্যমে—

> '...শালা মোরা কী কাণ্ড করছি জাননি, বোমা ফাটান হিলা, আরো কত কী হবে, দেহ চর্চা হচ্ছে, ঘুড়ীটারে মারা হিলা, আগে অযোদ্ধ্যা কাণ্ড হিলা...। বলতে বলতে পেট চেপে বসে পড়ে সতীশ গিরি, গ্যাসের ব্যথা, এক ঘটি পানি লিয়ে এস ভানুবাবু।
>
> দুটি চোখ স্ফীত হয়ে বেরিয়ে পড়েছে প্রায়। জিভ বেরিয়ে পড়েছে সতীশের।'[৩৪]

আর এও তো সত্য, পাঁচজন দাঙ্গাবাজ হলে পাঁচশ জন থাকে দাঙ্গাবিরোধী, অশুভ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের বিপরীতে চিরকাল থেকে যায় কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক, তাই তো পৃথিবী আজও বাসযোগ্য। তাই সতীশের মতো যারা পুরমাণু বোমার বিস্ফোরণের ফলে কন্থকের ডানা বেরিয়ে সে উড়ে গেছে—ধরনের সুবিধাবাদী গল্প বোনে, মানুষকে ভুল পথে চালিত করে তাদের বিপরীতে কোকিলা জানাতে চায় আসল কাহিনিটা তার সৃষ্টির মাধ্যমে। কোকিলা শিল্পী। সে প্রথমে যে ঘোড়ার ছবি মদরঞ্জিকে এঁকেছিল তা দেখে ভানুর মনে হয়েছিল এই তার কন্থক। কিন্তু সেটি বিক্রি হয়ে যায় কলকাতায়। ভানুর অনুরোধে সে আবার আঁকতে বসে। কিন্তু যে ঘোড়ার ছবি প্রথমে সে এঁকেছিল সহজেই, তা এবার আর হতে চায় না। সে শুনে পোখরানের কথা, হিরোসিমা নাগাসাকির কথা। সে জানতে পারে পোখরানে পরমাণু বোমা ফাটিয়ে চতুর্দিকে যে তেজস্ক্রিয় বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া হল, তা দেশের শক্তি বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু সে বুঝতে পারে না দেশ যদি মানুষ নিয়ে হয়, তাহলে পেটে ভাত না থাকলে কী করে শক্তি বাড়ে। অবশেষে সে আঁকে। এবার আর আশ্বিনের নীল আকাশের চালচিত্রে কেশর ফোলানো সাদা ঘোড়া নয়, এবার পৃথিবীর বুক ফেটে কালো ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশ পর্যন্ত আর ঘোড়া তা থেকে বাঁচার চেষ্টায় পালাচ্ছে। ঘোড়াটির চোখ বিস্কারিত,

নাসারন্ধ্র ফুলে উঠেছে কেশর পুঞ্জ ঘাড়ের উপর দাঁড়িয়ে গেছে। প্রচণ্ড আতঙ্কে ঘোড়াটির গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে। কথা ছিল শ্রীপতি এই মদরঞ্জিটি কিনে নেবে, কিন্তু সে তো নিলই না, উপরন্তু যে জানতে চাইল এমনটা কেন। আধিপত্যবাদের পৃষ্টপোষক শ্রীপতির মতে এমনটা আঁকা ঠিক হয়নি। কিন্তু কোকিলা জানে এটাই সত্য, জানে সুভদ্রাও আর কেবল জানা নয়, এ তো তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। রূঢ় সত্য যখন তার নখদন্ড নিয়ে প্রকাশিত হল তখন শ্রীপতি ভয় পেয়ে যায়। মায়ার চাদর যেন সরে যেতে থাকে, কোকিলার প্রতি মোহ আর থাকে না। সুভদ্রাকে সে যে ক্ষমতায় রামচন্দ্রের সঙ্গে যেতে না দিয়ে নিজের মুঠোয় রেখেছিল সেই ক্ষমতাও হঠাৎ করে যেন সে খুঁজে পায় না। সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচার করার ক্ষমতা রাখে না, এ সত্য সে বলার বা জানানোর সাহস সে করে না। কিন্তু কোকিলা সে সাহস রাখে। সে বলে—

> '...এটি লিয়ে তুমার গৌরদাদা হাটে হাটে ঘুরবে, না বিকোক, লকে তো জানবে
> কেন পলাইছিল পংখিরাজ।'[৩৫]

আর সুভদ্রা সাহস পায় 'মদরঞ্জির উপর আঁকা দেখে' অথবা কোকিলাকে দেখে। রামচন্দ্র পারেনি শ্রীপতির বিরুদ্ধাচরণ করার কিন্তু এবার সুভদ্রা করে। সে চলে যায় রাতের অন্ধকারে শ্রীপতির হোটেল ছেড়ে। এভাবে ঘোষিত হয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কোকিলা পরোয়া করে না দক্ষিণপন্থী উগ্র জাতীয়তাবাদের নেশায় উন্মাদ মানুষদের। সে স্বেচ্ছায় কাঁধে তোলে নেয় সত্য কথনের দায়িত্ব। সুভদ্রা পুরুষতন্ত্র আর পুলিশি অত্যাচারের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে হতেও ঘুরে দাঁড়াতে চায় বারবার। শেষ পর্যন্তও সে ভালোবাসার বন্ধন ছাড়া আর কোনো বাঁধনে বাঁধা থাকতে চায়নি। তাই সে বেরিয়ে যায় অজানার উদ্দেশ্যে।

দশ

মরণ ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। বাতাসে ভাসছে মরণের গন্ধ। তাই বলে জীবন কি থেমে থাকতে পারে! তাই কুন্তি বিক্রি হয়ে যাওয়ার পরও তার বাবা-মা আবার স্বপ্ন দেখে, আবার সন্তানের আগমন সংবাদে শিহরিত হয়, সংসার সাজায়। দুঃসময়ে বসে সময়ের যথার্থ স্বরূপ উদঘাটন করেও মানুষকে নিরাশার ঘোরে নিমজ্জিত না করে কথাকার দেখান আশার আলো। তিনি তাঁর এ উপন্যাসে বিশ্ব উষ্ণায়ন,

সমুদ্রের তেল গাদ, পরমাণুর তেজস্ক্রিয়তার কথা বলেন, বলেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথাও, কিন্তু আশার কিরণ রয়ে যায়।

আখ্যানের আপাত উপসংহারে এসে সব মানুষকে সরিয়ে দিয়ে মনুষ্যেতর অশ্বই হয়ে উঠেছে প্রধান আকল্প। এবার কন্থকের কাহিনি পেলাম কন্থকেরই জবানিতে। বৈশাখের প্রচণ্ড রোদের পর এক পশলা বৃষ্টি আর পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-স্নাত আকাশ তার মনে বিভ্রম জাগিয়েছিল। একই দিনে দুই ঋতু পেরিয়ে যাওয়ার বিভ্রম তাকে আবিষ্ট করে, সে বাঁধন ছিঁড়ে পৌঁছে যায় সুবর্ণরেখার চরে। মরুভূমি সদৃশ গ্রীষ্মের উত্তপ্ত চরে তখন আর কোনো ঘোড়া ছিল না। ভুল বুঝতে পেরে সে ফিরে দীঘার পথে। কিন্তু পথ ভুল হল এবার। জনপদে পৌঁছে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল, এবার কোনো না কোনো ভাবে পৌঁছে যাবে গন্তব্যে। কিন্তু তার পেছনে জুটল কিছু যুদ্ধবাজ মানুষ। যাদের চোখে সে অশ্বমেধের ঘোড়া অথবা যবনের ঘোড়া । তবে যাই হোক না বধ্য এবং যুদ্ধের অজুহাত। তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সে ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে সে হয়তো বা পৌঁছে যায় মরুভূমিতে পোখরানে। সে অন্ধ হয়ে যায়, তার গায়ের রোম খসে পড়তে থাকে, কেশর পুচ্ছ ঝরে খেতে থাকে। রক্ত বেরোতে থাকে নাক মুখ দিয়ে। অন্ধ দুচোখ দিয়ে ঝরে পড়তে থাকে জল। আখ্যানের এই সমাপ্তি অংশটুকু সম্বন্ধে তাত্ত্বিক সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য লেখেন—

> 'উপন্যাসের সমাপ্তি বিহীন উপসংহারে অন্ধ ঘোড়া যেন হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় কুশীলব। মহাসময় ও খণ্ড সময়ের ব্যবধান মুছে যাওয়াতে ভাষায় ছড়িয়ে পড়ে পরাবাচনের দ্যুতি। বৈদিক যুগ এবং হিরোশিমা-পোখরানের অগ্নিবলয় মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। বয়ানের শেষ পাঁচটি পৃষ্ঠা যেন উপন্যাস নামক শিল্প মাধ্যমের সম্পূর্ণ বিনির্মাণের দৃষ্টান্ত। আমাদের ঘুমন্ত বিবেককে পর্যন্ত জাগিয়ে দেয় যখন অশ্বচরিত এর কেন্দ্রীয় আধেয়, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে উপন্যাসের মানুষেরা সরে যায় পেছনে। যেন বয়ন বিশ্বের পরিসর মঞ্চে রূপান্তরিত এবং পাদপ্রদীপের সমস্ত আলো কেন্দ্রীভূত হয়েছে ভূগোল ও ইতিহাসের বিভিন্ন পরিসরে উপস্থিত কন্থকের উপর। আত্মবিস্মৃত সময়ের দাহ তার গায়ের চামড়াকে ঝলসে দেয়। কালো বৃষ্টি ঝরে পড়ে সেই কালো মেঘ থেকে যা 'এখনো মাথায় ভেতরে বহন করে চলেছে মানুষ, হিরোশিমার মানুষ' (পৃ.৩৪১)। তার অন্ধ চোখের জল ছাড়া অন্য কোথাও জল ছিল না। আত্ম বিস্মৃতির অন্ধকারে সমস্ত কিছুকে কালো করে দিলেও অমর এই আশ্চর্য অনবদ্য মুক্ত উপসংহারে পৌঁছেছেন যে অন্ধ ঘোড়া তবু জ্যোৎস্না, আশ্বিন ও কাশফুলের কথা ভাবে।'[৩৬]

সে অন্ধ হয়ে গেছে, তবু তার চলা বন্ধ হয়নি। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে তার চলা তেজষ্ক্রিয় বিষ বাষ্পে ভরা এই সময় হয়ে ভবিষ্যতের দিকে। জেগে থাকে উত্তরণের আকাঙ্খা। আর্থ রাজনৈতিক শোষণ, সামাজিক নানা সংকট, রাষ্ট্রে ফ্যাসিবাদী চরিত্র বিভিন্নভাবে মানুষের জীবনে তৈরি করছে সংকট। মৃত্যু-হিংসা-শোকে ভরা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাও এক সমস্যা। কিন্তু তা সত্ত্বেও কী মায়া এই পৃথিবীতে! জন্ম জন্মান্তরে মানুষ ফিরে আসতে চায় এই ধবিত্রীর বুকেই। আর সেজন্যেই বোধ হয় সমস্ত সন্দেহ অবিশ্বাস, আত্মহননের তেজষ্ক্রিয়তা পেরিয়েও অন্ধ ঘোড়ার অনুভব থেকে জেগে ওঠে আলো—

'শুধু তার মাথায় ভিতরে বুদ্ধদেবের মতো প্রেমময় চাঁদ ছিল। আলোর ছিল।
চাঁদ আর আলোর স্মৃতি ছিল। সমুদ্র ছিল, বাতাস ছিল, সবুজ তৃণভূমি ছিল।
ছিল সেই রাজপুত্র যার মাথায় মাথায় চলত সোনালি রঙের মেঘ, শ্বেত কবুতর
উড়ত যে মেঘে, সেই মেঘের দিনগুলি স্মৃতিতে আছে।'[৩৭]

জীবনের অনতিক্রম্য ভবিষ্যৎ মৃত্যু। জীবনের ভিতরেও মৃত্যু, সুতরাং মৃত্যুর ভিতরেও মৃত্যুই। প্রকৃতি যেমন মৃত্যুর ফাঁদ তৈরি করে, মানুষ তেমনি অন্যের জন্যে মরণ ফাঁদ তৈরি করতে গিয়ে নিজের জন্যেই বানায় বিনাশক অস্ত্র। বিশ্বযুদ্ধ ও হিরোশিমা নাগসাকির হিংস্রতা দেখে জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন—

'দুশ্চর সমুদ্র ঘিরে বধির বদ্বীপ—ইতস্ততঃ—

নিস্পৃহ ভূখণ্ড নিয়ে

এক একজন

আজ এই পৃথিবীর

স্তূপীকৃত অন্ধ নির্বান্ধব

লোহার শকট ভরা আবিষ্ট মানব।' *(পৃষ্ঠা - ৫১৩/কাব্য সংগ্রহ)*

এখন চোখের সামনে ঘটে চলছে ইরাক-বসনিয়া-চেচেনিয়া-অযোধ্যা-কারগিল আর আমরা এ সব কিছু দেখেও প্রত্যেকে বাস করছি বোকা বাক্স, বিশ্বজাল আর প্রযুক্তি সমৃদ্ধ নিজস্ব নিস্পৃহ ভূখণ্ডে। তাই দেখি শ্রীপতি নিজের ঘরের অন্ধকার কোণায় সুরক্ষা খোঁজে, অথবা দেখে শুনে বোঝেও না দেখা, না শুনা আর না বোঝার ভান করে। কিন্তু সবাই তো শ্রীপতির মতো অন্ধ হয়ে প্রলয় বন্ধ করার বোকামিতে বিশ্বাসী নয়। কিছু কিছু মানুষ তো জানে অপারেশন টেবিলে শায়িত রোগীর মতো ধীরে ধীরে মহাসুষুপ্তির দোরগোড়ায় পৌঁছানোর চেয়ে—

‘.....better to feel ourselves dying, even in the convulsions of terrorism, than to disappear like ectoplasms which no one, even desensitized, will want to conjure up later to give themselves a fright.[৩৮]

তাই তো দেখি ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার চেয়ে সংগ্রামকেই বেছে নিয়েছে সুভদ্রা, কোকিলা। কন্থক তাই মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়েও স্বপ্ন দেখে আলোর আর মরে যেতেও চেষ্টা করে উঠে দাঁড়ানোর। আর তাই তো কবি বলেন, ‘মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।’ (১২১ জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা) অথবা—

‘পৃথিবীর পুরনো সে পথ
মুছে ফেলে রেখা তার—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয়!
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব—
নক্ষত্রেরো আলো শেষ হয়!’[৩৯]

ধ্রুবপুত্র

এক

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজন্মের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,

কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা-আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরিতেছি বহুদূরে পথ চিনে চিনে।।

মহাকাল-মন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীরমন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি, ঊর্ধ্বে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্য-'পরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা।।[১]

অথবা

আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে,
একটি শ্লোকের স্তুতি গেয়ে রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে কানন-ঘেরা বাড়ি।
রেবার তটে চাঁপার তলে সভা বসত সন্ধ্যা হলে,
ক্রীড়াশৈলে আপন-মনে দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি।
জীবনতরী বয়ে যেত মন্দাক্রান্তা তালে,
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।।

চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি, থাকত নাকো ত্বরা,
মৃদুপদে যেতেম যেন নাইকো মৃত্যু জরা।
ছটা ঋতু পূর্ণ ক'রে ঘটত মিলন স্তরে স্তরে,
ছটা সর্গে বার্তা তাহার রইত কাব্যে গাঁথা।
বিরহদুঃখ দীর্ঘ হত তপ্ত অশ্রুনদীর মতো
মন্দগতি চলত রচি দীর্ঘ করুণ গাথা

আষাঢ় মাসে মেঘের মতন মন্থরতায় ভরা
জীবনটাতে থাকত নাকো একটুমাত্র ত্বরা।। [২]

কালিদাসের কাল, উজ্জয়িনী, শিপ্রা-রেবা নদী, মহাকাল মন্দির, মেঘদূত— সবকিছু মিলিয়ে আমাদের মনের কোণে কবে থেকে তৈরি হয়ে আছে এক অভিনব স্বপ্নরাজ্য। জন্ম রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পূর্বজন্মের কল্পনা করতে গিয়ে পৌঁছে গেছেন কালিদাসের কালে। আবার কখনো মৃত্যুজরাহীন হিসেবে বর্ণনা করেছেন সেই সময়কে। কালিদাস 'মেঘদূত'-এ তো তাই বলেছিলেন— 'ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি'। কালিদাসের উজ্জয়িনী সব পেয়েছির দেশ, স্বপ্নের দেশ — যক্ষপুরী অলকা, উজ্জয়িনী অথবা বিদিশা সবই আশ্চর্য সুন্দর স্বপ্নপুরী। কিন্তু কেবল স্বপ্ন দিয়ে তো বাস্তব তৈরি হয় না। আর প্রায় সময়ই বাস্তব আর স্বপ্ন হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। কালিদাসের সেই কাল, ভারতবর্ষের তথাকথিত স্বর্ণযুগের চেহারা কেমন ছিল— তার বাস্তব চিত্র নির্মাণ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে এসে প্রাপ্ত সামান্য কিছু ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক নিদর্শনের সাহায্যে সেই সময়ের ছবি তৈরি করতে গেলে আমাদের কল্পনার সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। মহাকবি কালিদাস তাঁর রচনার মাধ্যমে এমন এক আবেশ সৃষ্টি করেছেন যে পরবর্তী সাহিত্যিকরা যখনই সেই সময়ের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন তাঁদের চোখে পড়েছে ঐশ্বর্যবতী উজ্জয়িনী। কল্পনার এক বাঁধা ছকে তাঁরা হেঁটেছেন। কিন্তু ছকের বাইরে যে বিশাল জায়গা থাকতে পারে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন প্রথম অমর মিত্র তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস 'ধ্রুবপুত্র' (২০০২)-এর মাধ্যমে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, অমর মিত্র আখ্যানটি উৎসর্গ করেছেন এই উপমহাদেশের সেইসব মানুষদেরকে 'যাঁরা বাঁচেন কিংবদন্তীর ভিতরে'। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বাসব দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন—

> 'কিংবদন্তির মধ্যে বেঁচে থাকার সুযোগ আমাদের, বিচিত্র যাপন প্রণালীতে বেঁচে থাকার আনন্দে আর এক সফল সংযোগ ঘটানো কম কথা নয়। কথাকার অমর মিত্র সচেতন প্রচেষ্টায়, দীর্ঘদিনের অধ্যবসায়ে আমাদের কিংবদন্তির দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করেছেন আরও এক জীবন্ত কিংবদন্তি 'ধ্রুবপুত্র'।'[৩]

আমরা জানি 'Every text is interlinked and every text has a pretext'। 'ধ্রুবপুত্র' সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর সঙ্গে, প্রচলিত কিংবদন্তির সঙ্গে আর ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে। আবার লক্ষণীয় বিষয় 'ধ্রুবপুত্র'-এ অমর মিত্র যথাপ্রাপ্ত কাহিনিকে পুনর্নির্মিত করেছেন। 'মেঘদূত' কাব্য তো বর্ষণ উৎসবের কাব্য। 'মেঘদূতে' শিপ্রা-রেবা-বেত্রবতী নদীর জলে মেঘ নিজের মুখ দেখে, আকাশ মেঘভারে নত হয় মহাকাল মন্দিরের উপর, মেঘের গর্জনে সারস গর্ভধারণ করে। অথচ বাস্তব উজ্জয়িনী তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা নিয়ে ধরা দেয় কথাকার অমর মিত্রের সামনে। 'আমার বাস্তবতা

আমার লেখালেখি' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

> 'বর্ষায় উজ্জয়িনী গিয়ে দেখি সে দেশে বর্ষা হয়ই না। যে নগরের কবি মেঘদূত কাব্য লেখেন, সেই নগরে ন্যূনতম বৃষ্টি হয়ে থাকে। জলকষ্ট খুব। গ্রীষ্মকালে দুদিন অন্তর জল পায় নগরবাসী। সমস্ত বছরে সতেরো-আঠারো ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। শিপ্রানদীটি আছে। মহাকাল মন্দির আছে, কিন্তু আকাশে মেঘ কই? উজ্জয়িনি, দশার্ণ দেশ (বিদিশা নগরী) কোথাও তো তেমন বৃষ্টি হয় না, অথচ কবি কিনা মেঘের কথাই লিখে গেছেন। তখন মনে হয়েছিল মেঘদূত কাব্যটি কি আসলে মেঘের আকাঙ্ক্ষা? যে দেশে মেঘেরই তেমন গভীর আনাগোনা নেই, সেই দেশের কবি যখন মেঘের কথা লেখেন, তখন তো মেঘের আকাঙ্ক্ষার কথাই মনে করিয়ে দেয়। মেঘ ও বৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন বৃষ্টিহীন পৃথিবীর কবি।
>
> ধ্রুবপুত্র উপন্যাস রচনার মূলসূত্র এখানে।'[৪]

অমর মিত্র তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সাহায্যে উন্মোচন করেছেন এক নব ইতিহাস— যা আমাদের বর্তমান সময়ের বলা যেতে পারে।

দুই

'ধ্রুবপুত্র' উপন্যাসটির পটভূমি উজ্জয়িনী। উপন্যাসটির ব্লার্বে লেখা হয়েছে উপন্যাসটির পটভূমি প্রাচীন ভারতের উজ্জয়িনী, শিপ্রা নদী তার চারদিক — পশ্চিমের সৌরাষ্ট্র, মরুদেশ, উত্তর-পশ্চিমের সিন্ধুনদ, পুরুষপুর, গান্ধার, বাহ্লিক দেশ, হিন্দুকুশ পর্বতমালা, অক্সাস নদী, দক্ষিণের বিদিশা নগর, পুবের পাটলিপুত্র থেকে লোহিত্যনদ — সমগ্র ভারতবর্ষ। উজ্জয়িনী নাম দিয়ে যেন কথাকার এক অনির্দিষ্ট স্থানকে 'a local habitation and a name' দিয়েছেন। অন্যদিকে আখ্যানের সময় সম্পর্কে কোনো সরাসরি অঙ্গুলি নির্দেশ তিনি করেননি। ইতিহাসের পাতায় রাজা ভর্তৃহরির উল্লেখ নেই।

ইতিহাসের ঠিক কোন সময়ের আখ্যান 'ধ্রুবপুত্র' তা যদি নির্দিষ্ট নাও করা যায়, তাতে উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তুতে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না। কারণ এখানে কেবল প্রাচীন সময়ের কথা বলা হয়নি, একই

সূত্রে গাঁথা হয়ে এসেছে বর্তমান সময়ও। আমরা জানি যে, লেখকের যাপিত সময় কোনো না কোনো ভাবে তাঁর লেখাকে প্রভাবিত করে। ঐতিহাসিক কোনো রচনাতে ছায়া ফেলতে পারে তাঁর সমসময়। তবে সবচেয়ে বড়ো কথা হল আখ্যানকারের ভাবাদর্শ। তাঁর ভাবাদর্শই ঠিক করে নেয় তিনি কোন বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করবেন অথবা কীভাবে কোনো বিষয়কে বিশ্লেষণ করবেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবাদী মন কিছুতেই রোহিণী অথবা কুন্দকে জীবিত রাখতে পারেনি। ইংরেজি রোমান্স সাহিত্য ও স্কটের উপন্যাস প্রীতি তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে রোমান্সের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের আঁতের কথা লিখতে গিয়েও দার্শনিক তত্ত্বকে সম্পূর্ণ বাতিল করেননি। আবার লক্ষণীয় বিষয় দু'জনের উপন্যাসের কোনো নায়ককে কখনো অন্ন সংস্থানের বিষয়ে চিন্তা করতে হয়নি। বিভূতিভূষণ মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য সম্বন্ধে সচেতন থেকেও দেখেছেন প্রকৃতির হাতে সমস্ত দুঃখ ভুলিয়ে দেওয়ার এক আশ্চর্য জাদুদণ্ড আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্ক্সবাদ ও ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবাদর্শের ভিন্নতা প্রত্যেক লেখককে সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করে। অমর মিত্র 'ধ্রুবপুত্র' রচনা করতে গিয়ে আজ থেকে বহু বছর আগের এক নগরের কথা বললেও তিনি তথাকথিত ইতিহাসের পথে হাঁটতে যাননি। ঐতিহাসিক চরিত্র, রাজা-রানি তাঁর আখ্যানের প্রধান বিষয় নয়। তিনি মানসচক্ষে দেখেছেন তাদের, যাদেরকে ঐতিহাসিকরা তাঁদের গ্রন্থে স্থান দেন না। তিনি দেখেন নগরের প্রান্তে বসবাসকারী শূদ্রজাতি, অর্থাভাবে নিজের সন্তান বেচে দেওয়া পিতা-মাতা, গণিকালয়, নিষ্ঠুর কামুক পুরোহিত, শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে পুরোহিতের আঁতাত, দুর্ভিক্ষের খরার সময় হাওয়ায় ভাসতে থাকা নানারকমের গুজব। তাঁর গ্রন্থে তিনি তুলে আনেন তাদেরকে। আর সেজন্যই কালিদাসের সময়কাল নিয়ে রচিত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'কুমারসম্ভবের কবি' কিংবা গল্প 'অষ্টমসর্গ' থেকে 'ধ্রুবপুত্র' হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন রসাস্বাদক। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুটো রচনাতেই প্রাধান্য দিয়েছেন নিটোল গল্পকে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, সময়ের চেহারা তাঁর অন্বিষ্ট ছিল না। এক মহান কবির 'হয়ে ওঠা' নিয়ে যে সমস্ত প্রচলিত প্রত্নকথা আছে সেগুলোকেই তিনি সুসংবদ্ধ করেছেন উপন্যাসে। আর যিনি বিরহী যক্ষের যন্ত্রণার কথা লেখেন অথবা উমার তপস্যার কথা শোনান তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে সেই বিরহ, সেই তপস্যা ছিল কী না, থাকলেও তা কেমন ছিল— এ সমস্ত প্রশ্ন আমাদের মনে দীর্ঘদিন ধরে উত্থাপিত হয়েছে। শরদিন্দু সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সুখপাঠ্য কাহিনি রচনা করে। সম্ভবত তাঁর এছাড়া আর কোনো প্রচেষ্টাও ছিল না। অন্যদিকে উত্তর উপনিবেশবাদ, নিম্নবর্গীয় চেতনা, নারীচেতনায় নিষ্ণাত অমর মিত্র কেবল রাজপ্রাসাদের অন্তরালের কাহিনি অথবা কোনো ব্যক্তির কথা বলেই চুপ হয়ে থাকতে পারেননি— সাধারণ মানুষই তাঁর চোখে হয়ে ওঠে প্রধান। আবার পুরোনো দিনের কথা বলতে বলতে তিনি আমাদের সমসাময়িক সময়ের কথাও যেন শুনিয়ে দেন। তাঁর ভাষায়—

'. . . লিখতে লিখতে সমসময় যেন প্রাচীন সময়ে ছায়া ফেলে যায়। আসলে যে কালের ভিতর দিয়ে আমি অতিবাহিত করছি এই জীবন, সেই কাল কখনো আড়াল থাকতে পারে না। কোন না কোনোভাবে সে তার ছায়া বিস্তার করবেই। দু হাজার বছর আগের উজ্জয়িনীতেও সে যেন এসেছে রূপকের আশ্রয়ে। কখনো রাজকাহিনী তো লিখতে চাইনি, লিখতে চেয়েছি সাধারণ মানুষের কথা। শুধুমাত্র কাহিনী কথনে কী লাভ, যদি তার ভিতরে সময়ের অভিঘাত না থাকে। সময়কে দেখার জন্য নানা রূপকে তো প্রবেশ করতে হয়।' [৫]

'কোরক সাহিত্য পত্রিকা'য় 'নীরবতার রূপ' নামক প্রবন্ধটিতে অমর মিত্র তাঁর লেখালেখির বিষয়ে জানাতে গিয়ে যা লিখেছেন, তার মধ্যে উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতির শেষ কথাটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিজের সময়কে তিনি দুহাজার বছর আগের সময়ে নানা রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করছেন। তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে অপরিচিতীকরণের প্রকরণবাদী কৃৎকৌশল তিনি গ্রহণ করেছেন এখানে। এ কথা তো আমরা জানি যে জীবনের তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা শিল্পের লক্ষ্য। কিন্তু অভিজ্ঞতাকে শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করতে গেলে সরাসরি তাকে তুলে ধরা যায় না। সেরকম করলে তা নিছক সাংবাদিকতা হয়ে যায়। শিল্প হচ্ছে পরিচিত বস্তু বা অভিজ্ঞতাকে নানা উপাদান ও কৌশলের সাহায্যে অপরিচিত করে তোলার প্রক্রিয়া। আর এভাবে শিল্পী আমাদের নতুনভাবে দেখতে শেখান চিরপরিচিতকে। অমর মিত্রের 'ধ্রুবপুত্র'ও আমাদের বাধ্য করে পুরোনো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন নানা ঘটনাবলীকে আবার নতুন করে দেখতে। জ্ঞানহীন জগতে ক্ষমতার দম্ভের প্রতি নতুন করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কথাকার রূপকের আড়ালে তা প্রকাশ করে। শেষ পর্যন্ত তাই 'ধ্রুবপুত্র' কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের কাহিনি হয়ে থাকে না, তা হয় কাল, আজ ও কালকের কাহিনি— মহাসময়ের আখ্যান, সার্থক শিল্প।

তিন

'ধ্রুবপুত্র'-এর প্রেক্ষাপটে রয়েছে এক খরাপীড়িত রাজ্য। উজ্জয়িনীসহ সমগ্র অবন্তীরাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টি হয়নি। বৃষ্টিহীন কার্তিকের এক দিন থেকে কাহিনির শুরু। কিন্তু কার্তিকের দীপাবলির এই দিনটি থেকে কাহিনি বারবার এগিয়ে যায়। কখনো পাঁচ বছর আগে, যেদিন রেবার স্বামী কার্তিককুমার বেরিয়েছিলেন হূণদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথির সেই রাত আবিষ্ট করে রাখে রেবাকে।

আর কখনো প্রায় সাত মাস আগে, চৈতি পূর্ণিমার সেই দিন অপমানিত ধ্রুবপুত্র নিজের গ্রাম গম্ভীরা, নগর উজ্জয়িনী ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা দুই ঋতুতেই সুবৃষ্টি হয়নি। বৃষ্টিনির্ভর ভারতবর্ষে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে যে বৃষ্টি হয়, তার অভাব ঘটলে খরা এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অবন্তীনগরেও খরা ধীরে ধীরে প্রকট হয়েছে যত দিন গড়িয়েছে, যত কাহিনি এগিয়েছে। টানা তিন বছর ধরে চলে এই বৃষ্টিহীনতা। সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় 'ধ্রুবপুত্র ঃ একজন পাঠকের কাছে' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন—

> '. . . উপন্যাসটির মূল কেন্দ্র বৃষ্টি ঃ অনাবৃষ্টি ও তার সার্বিক অভিঘাত। ঐ অনাবৃষ্টির অর্থ বহুমাত্রিক, এ শুধু বৃষ্টির অভাব নয়।' [৬]

অনাবৃষ্টি যেসব সংকটের সৃষ্টি করেছে সেগুলি একই সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সংকট। সমালোচক পার্থপ্রতিমের মতে অনাবৃষ্টি যেন এই সমস্ত সংকটের প্রতীক। সমালোচকের কথা মেনে নিয়ে আরেকটু অগ্রসর হয়ে বলা যায় বৃষ্টি যেন জ্ঞানেরও প্রতীক অন্যদিকে অজ্ঞানতা অনাবৃষ্টির। আমরা আজকের সমাজেও দেখেছি হিংসা, লালসা, দুর্নীতি, হিংসার জন্মক্ষেত্র অজ্ঞানতা—প্রায় দুহাজার বছর আগের উজ্জয়িনীতে অনাবৃষ্টির গর্ভে লালিত হয়েছে মানুষের এই কুপ্রবৃত্তিগুলি। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কুশাসক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অজ্ঞানতাকেই কাম্য বলে মনে করে। কারণ জনতার বোধহীনতাই তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার উপায়। আখ্যানটিতে দেখি শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত, মহাকাল মন্দিরের পুরোহিত চায় অনাবৃষ্টির কাল দীর্ঘ হোক। তাহলে নগরে আগুন জ্বলবে এবং সেই আগুনের তাপে তাদের স্বার্থসিদ্ধি হবে।

দীর্ঘদিনের অনাবর্ষণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। তৈরি হয়েছে একের পর এক গুজব। কোথাও রটে গেছে সূর্যের রথের চাকা বসে যাচ্ছে, তারপর একদিন এমন আসবে যখন আর কখনো রাত হবে না। কোথাও শোনা গেছে রাজা অপুত্রক তাই বৃষ্টি হচ্ছে না। আর গুজবগুলিকে কিছু সংখ্যক মানুষ ব্যবহার করছে আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। আবার নিম্নবর্গীয় শূদ্র— যারা চিরকাল খেটে খায়, তারা অনাবৃষ্টির মধ্যে চেষ্টা করেছে জল আনতে। ভাগ্যের ওপর নির্ভর না থেকে তারা শ্রমকে অবলম্বন করতে চেয়েছে। যখন নগরের সপ্ত সরোবরে জল শুকিয়ে গেছে তখন তারা খোদাই করেছে রত্নসাগর। সরোবর আবার জলে পূর্ণ হয়ে গেছে। তারা অনাবৃষ্টি থেকে বাঁচার পথ দেখিয়েছে, কিন্তু দুর্বল অক্ষম রাজা গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের উপর নির্ভর করে বসে রইলেন, নগরের মানুষের প্রচেষ্টার কথা জানার চেষ্টা করলেন না। আর রাজার বিপক্ষে যারা ষড়যন্ত্র করছিল তারা এই ঘটনাকে চাপা দিয়ে দিল এমনকি জল ব্যবহারেও বাধা দিল তাদেরকে যারা জল এনেছে। বিভ্রান্ত জনগণ নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, নগর দিনেও হয়ে পড়ে জনশূন্য। বসন্ত আসে জীবনের গান শোনানোর জন্য কিন্তু খরার সময় বসন্তও

আসে মৃত্যুদূত হয়ে। মৃত্যুর ডঙ্কা শুনে হাহাকার করে ওঠে গৃহবধূরাও— 'বসন্ত নেই, মরণ আছে বসন্ত দিনে' (পৃ. ১৫৮)।

উপন্যাসটি একই সঙ্গে বর্ষণহীনতা ও বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষার কাহিনি হয়ে ওঠে। আবার কেবল বৃষ্টির জন্যে প্রতীক্ষাও নয়, প্রতীক্ষা আরো অনেক মানুষের জন্য, আরো অনেক কিছুর জন্য। বৃদ্ধ শিবনাথ প্রতীক্ষা করছে দীর্ঘদিন ধরে পুত্র কার্তিক কুমারের এবং ধ্রুবসখার পুত্রের। রেবার প্রতীক্ষা স্বামী এবং পুত্রসম ধ্রুবপুত্রের জন্য আর গন্ধবতী পথ চেয়ে আছে দয়িত ধ্রুবপুত্রের। জনপদ-কল্যাণী দেবদত্তা ধ্রুবপুত্রের জন্য প্রতীক্ষারত। অবন্তীরাজ ভর্তৃহরি সুবর্ষণ, প্রজাকল্যাণ ছাড়াও প্রতীক্ষা করছেন অবন্তীলক্ষ্মী রানী ভানুমতির মনে প্রেমের নবোন্মেষের জন্যে। সেনাপতি তথা রাজানুজ বিক্রম প্রতীক্ষারত রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার। অর্থাৎ বৃষ্টিহীনতা ও বৃষ্টিহীনতাজাত নানা সংকটের মধ্যে প্রতীক্ষা আছে মানে আশা আছে, সব আশা কখনোই পূর্ণ হয় না— এখানেও হয়নি কিন্তু তবু নিরুৎসাহের হাহুতাশ মাত্র এ আখ্যান নয়। আর যদি হত তাহলে উপন্যাসটি সার্থক হয়ে উঠতে পারত না কখনোই। 'ধ্রুবপুত্র' খরার রাজ্যে দাঁড়িয়ে মেঘ ও মেঘের আশার কাহিনিও বটে আবার চরম দুঃসময়ে দাঁড়িয়ে সুসময়ের আশার কাহিনিও বটে।

চার

'ধ্রুবপুত্র' উপন্যাসে বৃষ্টিহীনতার সঙ্গে আরো যে একটি বিষয় ঘুরে ফিরে এসেছে তা হচ্ছে ধ্রুবপুত্রের জন্যে প্রতীক্ষা। অনুপস্থিত এক ব্যক্তির উপস্থিতি ছড়িয়ে আছে আখ্যানটির প্রতি পৃষ্ঠায়। ধ্রুবপুত্র, যার গাত্রবর্ণ ছিল গ্রীসদেশীয় মানুষের মতো গৌর, চোখের মণি সমুদ্রনীল, উচ্চতা নাতিদীর্ঘ, মাথায় ঘন কালো চুল, যে অনায়াসে বিচরণ করত নগরশ্রেষ্ঠীর প্রাসাদে, নগরপ্রধানা বারাঙ্গনার কুঠিতে আবার শূদ্রপল্লীতে, সে বিতাড়িত হয় নগর থেকে। শিবনাথের সখা ধ্রুবের পুত্র, যে সম্পূর্ণ আখ্যানে নামহীন ধ্রুবপুত্র বলেই পরিচিত, সে এই আখ্যানের মুখ্য চরিত্র। কিন্তু অমর মিত্র 'অশ্বচরিত'-এ যেমন, তেমনি এই উপন্যাসেও নায়কের ধারণাটিকেই পাল্টে দিয়েছেন। আখ্যানের শুরুতেই আমরা দেখেছি শিবনাথ ধ্রুবপুত্রের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তারই চেষ্টায় নিয়োজিত। প্রায় সাত মাস হয়ে গেছে তার নগর ত্যাগে। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে তার নগর ত্যাগের কারণ। সে ভালোবেসেছিল নগরের শ্রেষ্ঠা নারীকে, দেবদত্তাকে। দেবদত্তার প্রণয় প্রত্যাশী সুভগ দত্ত এ খবর পেয়ে তাকে অপমান করে, দাস দ্বারা প্রহৃত করে নিজের প্রাসাদ

থেকে বের করে দেন। এই অপমানের জ্বালায় সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে গম্ভীরার দহে নেমে। সে নিজের পরিচয় দিয়েছে একেবারে অন্তিমে রাজার কাছে এভাবে—

> ‘আমি এক অপমানিত পুরুষ, আমি নিজেও প্রত্যাখ্যান করেছিলাম আমার অনুরাগিনীকে নিঃশব্দে, মহারাজ সবই যেন গত জন্মের কথা, সেই অপমানের পর নগর ছেড়ে যাই, আত্মহননে যখন নেমেছি গম্ভীরার দহে, দেবী সরস্বতী আমার সামনে আবির্ভূত হন.... ।’[৭]

অমর মিত্র এখানে পুনর্নির্মাণ করেছেন কালিদাসকে নিয়ে প্রচলিত সেই প্রত্নকথার যেখানে বলা হয় কালিদাস স্ত্রীর দ্বারা অপমানিত হয়ে বিদ্যালাভের জন্য আরাধনা করেন এবং অবশেষে দেবীর বরে সর্বশাস্ত্রবিশারদ হয়ে ওঠেন। যদিও এই উপন্যাসের শেষে ‘মেঘদূত’-এর শ্লোক এবং ‘কুমারসম্ভব’-এর উল্লেখ আছে কিন্তু ধ্রুবপুত্র তা রচনা করেছে এমন কথা বলা হয়নি, তবু কিংবদন্তিটির সুর ক্ষীণ হলেও যেন কোথাও বেজে উঠতে শোনা যায়। ধ্রুবপুত্র কালিদাস কিনা তা এক্ষেত্রে আমাদের বিচার্য নয়। কিন্তু এ বিষয় অবশ্যই লক্ষণীয় বর্ণাশ্রমের কঠোর বাধা নিষেধকে দুপায়ে মাড়িয়ে যে ক্ষত্রিয় যুবক শূদ্রপল্লীতে দীর্ঘসময় ব্যয় করত, নানা অজানা কথা জানাত সবাইকে সেই জ্ঞানী যুবক বিনা দোষে নগর থেকে বিতাড়িত হয়েছে। অনেকের ধারণা ধ্রুবপুত্রের চলে যাওয়ার ফলে বৃষ্টি আর হচ্ছে না। ধ্রুবপুত্রের চলে যাওয়া আসলে যেন জ্ঞানের নির্বাসন। ঔপন্যাসিক একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

> ‘ধ্রুবপুত্র জ্ঞানী। ধ্রুবপুত্র নেই, তাই জ্ঞানের আলো অন্তর্হিত হয়েছে নগর থেকে। নগর জুড়ে অন্ধকার, হিংসা আর দহন। ধ্রুবপুত্র কি এই ভারতবর্ষে আছেন? যদি মানুষের ভিতর জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলত, তাহলে কি দীর্ঘ সময় জুড়ে হত্যাকাণ্ড ঘটে যেত গান্ধীর দেশে? এই ভারতবর্ষকে দেখে কি মনে হয় ধ্রুবপুত্র আছেন?’[৮]

যদিও আমরা জানি যে লেখার পর লেখকের মৃত্যু ঘটে যায়। তখন তাঁর লেখা সম্বন্ধে মতামত একজন পাঠকের মতামত হিসেবেই গণ্য হয়। তবু এক্ষেত্রে আখ্যানকারের মতামতকে আমাদের গুরুত্ব দিতেই হয়। শূদ্রদের অনাবৃষ্টির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রয়াসকে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়, তাদের বসতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় শ্রেষ্ঠীর হুকুমে— আর এসব করা হয় কেবল নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। এই রকম অবস্থায় জ্ঞান কোথায়? অথবা একটু অন্যভাবে প্রশ্ন করা যায়— জ্ঞান থাকলে কি এমন হত? ‘ধ্রুবপুত্র’ যে কেবল মাত্র অতীতের চর্বিত চর্বণ নথির উল্লেখ নয়, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ‘ধ্রুবপুত্র’ আখ্যানটিতে অতীতের প্রেক্ষাপটে নানা রূপকের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে বর্তমান। বর্তমান ভারতবর্ষে শিক্ষা এবং জ্ঞান দু’য়েরই অভাব অনস্বীকার্য। যথার্থ জ্ঞানের অভাব বলেই জনগণ চালিত হয় সহজেই কিছু ভ্রষ্ট রাজনীতিবিদদের

দ্বারা। কার্ল মার্ক্স দীর্ঘদিন আগে বলে গেছেন যে ধর্ম একধরনের আফিং, অর্থাৎ একপ্রকার নেশার সামগ্রী। সেই নেশার সামগ্রী সামনে রেখে জনতাকে চালনা করার সহজ পদ্ধতি আগেও কাজে লাগানো হয়েছে আর এখনো হচ্ছে। অজ্ঞানতা জনগণকে রাজনীতিবিদদের এই সহজ সমীকরণ বুঝতে দিচ্ছে না। তাই ধর্ম, জাত-পাত নিয়ে আজও তৈরি হয় নানা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি।

জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয় অথচ কর্মসূত্রে বৈশ্য পিতার সন্তান ধ্রুবপুত্র সশরীরে আখ্যানে প্রবেশ করেছে বিরাশিতম পরিচ্ছেদে এসে। এরপর আখ্যানটি মাত্র দুটো পরিচ্ছেদ বিস্তৃত হয়েছে। অথচ আখ্যানের প্রধান চরিত্র নিঃসন্দেহে ধ্রুবপুত্র। পুরো আখ্যানে ধ্রুবপুত্র চর্চিত হয়েছে অন্যান্য চরিত্রের মাধ্যমে। এমনকি বৃষ্টির স্মৃতিও মিশে গেছে ধ্রুবপুত্রের সঙ্গে। শিবনাথ, রেবা, গন্ধবতী, দেবদত্তা তারই পথ চেয়ে থাকে। তারই বলা কথা বারবার ফিরে ফিরে আসে নানা চরিত্রের মুখে। তারই দেওয়া জ্ঞান অবলম্বন করে বৃদ্ধ পরাশর রত্নসাগর গভীর করার কথা ভাবে। দশার্ণ দেশীয় ধ্রুবপুত্রের সতীর্থ যুবক তাম্রধ্বজ যাকে দেখে ধ্রুবপুত্রের কথাই সবার মনে পড়ে, সে ধ্রুবপুত্র সম্বন্ধে ভাবে—

> '...এমনভাবে চলে গেছে সে, যে তার নিষ্ক্রমণের কথা প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করাচ্ছে প্রতিজনকে। সে চলে গিয়েও তাই রয়ে গেছে।' [৯]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটক 'জুলিয়াস সিজার'-এ তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে জুলিয়াস সিজারের হত্যা সংঘটিত হয়। তারপর সিজারের প্রেতাত্মা নাটকটিতে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিল। মৃত্যুর আগে ব্রুটাস বলেছে—

> '...The ghost of Caesar hath appeared to me
> Two several times by night; at Sardis once,
> And this last night here in Philippi fields.
> I know my hour is come.' [১০]

সিজারের প্রেতাত্মাই কেসিয়াসকে আত্মহননে প্ররোচিত করে এবং ব্রুটাসের পরাজয়-মৃত্যু ত্বরান্বিত করে। জীবিত সিজারের থেকে মৃত সিজার যেন অনেক বেশি সক্রিয় ও ক্ষমতাবান। বিদেশি সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেও আমরা পেয়েছি 'রক্তকরবী'। যেখানে রঞ্জনের অনুপস্থিতির মধ্যেও সে আছে নন্দিনীর চিন্তায়, কথায়, প্রত্যেক কাজে। এমনকি মৃত্যুর পরও রঞ্জন শেষ হয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেকার্থদ্যোতক অসাধারণ এই নাটকটি ছাড়াও 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী মৃত সন্তানের জননী সুজাতার স্মৃতি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন সদ্যমৃত ছেলে ব্রতীকে। 'ধ্রুবপুত্র' যেন সেই ঐতিহ্যবাহী

উপন্যাস। যেখানে প্রধান কুশীলবের অনুপস্থিত-উপস্থিতি জুড়ে আছে সম্পূর্ণ উপন্যাস।

আখ্যানের শেষ তিনটি পরিচ্ছেদে যখন ধ্রুবপুত্রের সশরীরে প্রবেশ ঘটে তখন তাকে আমরা দেখি দীর্ঘ আখ্যান জুড়ে নির্মিত তার মূর্তি থেকে অনেকটাই আলাদা। যে ধ্রুবপুত্র পিতৃসখা তথা শ্রেষ্ঠীর দ্বারা লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে নগর ত্যাগ করে এবং যে ধ্রুবপুত্র প্রায় তিন বছর পর ফিরে আসে তারা যেন এক নয়। সে নিজে বলে—

> '... এই অনাবৃষ্টি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছে মহারাজ, এই অনাবৃষ্টিতেই আমার জন্ম ধরে নিতে পারেন, এই অজন্মার ভিতর আমি জন্মেছি ভেবে নিতে পারেন, আমার মনে হয় আমিই যেন অন্য কোনো মানুষের প্রতিনিধি, যে মানুষ দেখেছিল বর্ষার মেঘ, বৃষ্টি, ফসল ....।' [১১]

ধ্রুবপুত্রের যে স্বরূপ আমরা আগে অন্যান্যদের বর্ণনায় পেয়েছি, তাতে মনে হয় সে জ্ঞানী, স্বভাবকবি কিন্তু তখনো সম্পূর্ণতা পায়নি তার ব্যক্তিস্বার্থ ও অহংবোধ জয় করার প্রক্রিয়া। অনাবৃষ্টির ভীষণ রূপ, হিংসা, হিংস্রতা তাকে জীবনকে নতুন করে দেখতে শিখিয়েছে। তাই সে যখন ফিরেছে তখন নিজের অহং সে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে ফিরেছে। রাজা ভর্তৃহরিকেও সে তাই তো করতে বলে। ব্যক্তিস্বার্থের বহু উর্ধ্বে জনগণের কল্যাণ, তাই জনহিতার্থে ব্যক্তিস্বার্থ বলি দেওয়া উচিত। তাই কি অমর মিত্র ধ্রুবপুত্রের কোনো নাম দেন নি? সে রাজাকে বলে 'আমার কোনো পরিচয় নেই' (পৃ. ৩৫৮)। শাসনাধিপতি রাজা কতজন মানুষকেই বা চেনেন। ধ্রুবপুত্র হতে পারে যে কোনো তিমিরবিনাশী স্বপ্নদ্রষ্টা সাধারণ মানুষ। স্বপ্নদ্রষ্টারাই তো পারে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও জীবনের জয়গান গাইতে। চরম রিক্ততার মধ্যে ধ্রুবপুত্র মেঘের কথা বলে, বৃষ্টির কথা বলে। যে আরো জানে স্বপ্নদ্রষ্টা এই মানুষেরা হয় কবি। সে বলে—

> '... সেই কবি জেনেছেন এই নির্দয় প্রকৃতির বিপক্ষে দাঁড়াতে পারে তাঁর শ্লোক, তাঁর কাব্য, কবির কাজ তো সিংহাসনে বসে থাকা নয়, মানুষের পৃথিবীতে বেঁচে নিজের হৃদয়কে উন্মোচন করা, জন্ম থেকে আষাঢ়ের মেঘ দেখেছেন যে কবি, অনাবৃষ্টির কালে মেঘের স্মৃতিই তো জেগে উঠবে বারে বারে।' [১২]

কবিরাই তো জানেন বন্ধ্যা রিক্তধ্বস্ত জীবন চিরন্তন সত্য নয়, দীর্ঘকাল এভাবে কাটতে পারে না, নবজীবনের বর্ষা নামবেই। নবজীবনের বার্তা নিয়ে আসবে আষাঢ়। প্রায় দুহাজার বছর আগের উজ্জয়িনীর বৃষ্টি-বিরল বন্ধ্যা-প্রায় বুকে বসে এক মহাকবি শুনিয়েছিলেন হর-পার্বতীর মিলনের কথা, শুনিয়েছিলেন জলভারে নত মেঘের কথা। আজকের এই তপ্ততাপ ক্লিষ্ট অসুখের সময়ও একজন কবিই শোনান আশার

বাণী—

‘মনে হয়েছিল অনাবৃষ্টিই নিত্য
দগ্ধে দগ্ধে দিনগুলি বুঝি মরবে,
স্নায়ুর অশ্রু প্রতি শরীরেই ঝরবে,
থেকে যাবে মাটি রুক্ষ, আকাশ রিক্ত।
তবুও আষাঢ়ে পূর্বমেঘেরা নামল
আমাদের এই প্রথম দিনের আষাঢ়।
... জীবন মানবজীবন থাকবে রিক্ত!
কবে যে মানুষও আষাঢ়ের গান করবে
আমাদের এই নবজীবনের আষাঢ়।’

(আষাঢ়/ আলেখ্য/ বিষ্ণু দে)

এ তো কোনো একক কবির কথা নয়। ধ্রুবপুত্রকে যখন রাজা প্রশ্ন করেন মেঘদূতের রচয়িতা কবি কি সেই, তখন ধ্রুবপুত্র সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে একটু বঙ্কিমভাবে দেয়। সে বলে—

‘সেই কবি হয়ত দশার্ণের পথে। সেই কবি হয়ত কালামুখীর গাঁয়ে নিষাদগৃহে, মগধে, কোশলে, পাটুলিপুত্রে, গঙ্গার কুলে রেবা নদীর তীরে, বেত্রবতীর কুলে, নীচৈঃ পাহাড়ের গুহায়, অলকাপুরীর পথে, রামগিরির কোলে, হয়ত অচেনা কোনো এক নদীতীরে মিলনের মধুরতায় আবিষ্ট...।’ [১৩]

পাঁচ

হিন্দু শাসনাধীন ভারতবর্ষকে নিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ পক্ষপাত আছে। বিশেষত গুপ্তযুগকে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান ধরে নিয়ে সেই সময়কে যথেষ্ট পরিমাণে বিভূষিত করার একটা প্রচেষ্টা লক্ষণীয় হয়। কিছুদিন আগে যেভাবে ইতিহাসের গেরুয়াকরণ শুরু হয়েছিল তার মধ্যে গুপ্তযুগকে নিয়ে কিঞ্চিৎ

প্রয়োজনাতিরিক্ত রঙ চড়ানো যে হবে তা আর আশ্চর্য কী। যদিও কোনো কোনো ঐতিহাসিক গুপ্তযুগকে সুবর্ণযুগ বলে স্বীকার করতে চাননি। ড° ডি. এন. ঝা সুবর্ণযুগের মিথকে নানাভাবে খণ্ডন করে পরিসমাপ্তিতে লিখেছেন—

> 'For upper classes, all periods in history have been golden ; for the masses; none. The true golden age of the people does not lie in the past, but in the future.' [১৪]

অমর মিত্র তাঁর মতো করে উপন্যাসে এই মিথটিকে ভেঙেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো সেই সময়ের উজ্জয়িনীবাসী যথার্থই সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের রিক্ততাই প্রকট। চালর্স ডিকেন্স উনবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে লিখেছিলেন—

> 'It was the best of times, it was the worst of times,
> it was the age of wisdom, it was the age of foolishness,
> it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity,
> it was the season of Light, it was the season of Darkness,
> it was the spring of hope, it was the winter of despair,
> we had everything before us, we had nothing before us...'[১৫]

এই একই মন্তব্য খুব অপ্রাসঙ্গিক হয় না, যেমন একবিংশ শতাব্দীর আজকের দিনে, তেমনি গুপ্তসাম্রাজ্যের সেই তথাকথিত সুবর্ণযুগেও। সাধারণত ঐতিহাসিকরা প্রাচীন সময়ের বিবরণ খুঁজে পান সেই সময়ের নানা সাহিত্যিক নিদর্শন এবং বিভিন্ন গ্রন্থাবলী, মুদ্রা, প্রস্তরলিপি প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং বিদেশি ভ্রমণকারীদের বিবরণী থেকে। গুপ্তযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে কালিদাসের রচনাবলী থেকে সংগৃহীত হয়েছে নানা তথ্যাবলী। অমর মিত্র বর্তমান সময়ে বসে প্রাচীন সময়ের প্রেক্ষাপটে মহাকাব্যিক উপন্যাস লিখতে গিয়ে কালিদাসের 'মেঘদূত'কে সামনে রেখেছেন কিন্তু সেই স্বপ্নিল আবেশকে ভেঙে বিনির্মাণ করেছেন। আর বিনির্মিত সেই ছবিতে রয়েছে রূঢ় বাস্তবতা। প্রাবন্ধিক শুভময় মণ্ডল 'ধ্রুবপুত্র' সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—

'প্রাচীন সাহিত্যের যে গ্রন্থটিকে অমর তাঁর উপন্যাসে সব থেকে বেশি ব্যবহার করেছেন তা মেঘদূত। 'ব্যবহার করেছেন' বাক্যখণ্ডটি নিশ্চয়ই খুব মূঢ় রকমের সাদামাটা হয়ে গেল। আসলে মেঘদূত এই উপন্যাসের প্রতীয়মান বয়নের ঠিক পরবর্তী স্তরে বয়ে যাওয়া সমায়তনিক স্রোত, যার নিহিত গহনছায়া প্রায়শই প্রতীয়মান বয়নেও আভা বিছিয়ে দেয়, মায়া (যে মায়া ছিঁড়ে ফেলাই অমরের উপন্যাসের কাজ) বিছিয়ে দেয়। উপন্যাসের শেষে মেঘদূত আর প্রতীয়মান বয়নের আড়ালে থাকে না। প্রতীয়মান বয়ন জুড়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। অথবা এমন বলা যেত মেঘদূত প্রতীয়মান বয়ানের আড়াল ভেঙে বিকশিত হয়ে উঠে তবে সে উপন্যাসকে শমে পৌঁছে দেয়।' [১৬]

কালিদাসের 'মেঘদূত'-এ যক্ষ রামগিরি পর্বত থেকে অলকাপুরীতে যাওয়ার জন্য মেঘকে যে যাত্রাপথ বর্ণনা করেছে, সেখানে দশার্ণ ও উজ্জয়িনীর বর্ণনা রয়েছে ২৪ থেকে ৪০ নং শ্লোকে। এই বর্ণনায় কেবল ভৌগোলিক বিবরণ কবি দেননি, তাঁর বর্ণনায় এসে মিশেছে যক্ষের প্রণয়ীচিত্তের কামনার রঙ। দশার্ণ প্রদেশ মুকুলিত কেতকী ও ফলবান জামগাছে পূর্ণ। পরিযায়ী হংস এবং স্থানীয় পাখিরা মাতিয়ে রেখেছে চতুর্দিক। তার রাজধানী বিদিশা। বিলাসী নাগরিকা এবং তরঙ্গিনী বেত্রবতী রাজধানীর সৌন্দর্যবৃদ্ধি করছে। পাশে নীচে পর্বতের গুহাকন্দর প্রণয়ীদের মিলন স্থান। গুহা থেকে আসা রতিপরিমল ঘোষণা করছে বিদিশার যৌবন-মহোৎসবের কাহিনি। তারপর নির্বিন্ধ্যা নদী এবং সিন্ধু নদী। সিন্ধু নদী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জলের অপ্রতুলতার খানিকটা ইঙ্গিত যেন পাওয়া যায়। কালিদাস লিখেছেন—

'বেণীভূতপ্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ।।'[১৭]

তবে উজ্জয়িনী-বিশালা-ধরাধামে স্বর্গখণ্ড। সুশীতল শিপ্রানদী রমণীদের রতিক্লান্তি দূর করে। গৃহপালিত ময়ূর এবং সুন্দরী নারীরা গৃহের শোভা বর্ধন করে। মহাকাল মন্দিরে প্রত্যহ সন্ধ্যারতি হয় সাড়ম্বরে। বরবর্ণিনী দেবদাসীদের বর্ণনা যক্ষ দিয়েছে মেঘের কাছে—

'পাদন্যাসৈঃ কৃণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈঃ
রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।

বেশ্যাস্ত্বত্তো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দু-

নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্।।' [১৮]

রাত্রিকালে সেই নগরে অভিসারিকারা সঙ্কেতস্থানের উদ্দেশ্যে অন্ধকার গায়ে জড়িয়ে পথে বেরোয়। উজ্জয়িনী থেকে বেরিয়েই পাশে স্নিগ্ধ নির্মল গম্ভীরা নদী। তার দুই পাশে বেতগাছের ঝাড়। এই হল দশার্ণ এবং অবন্তীর বর্ণনা। 'মেঘদূত'-এর দশার্ণ-উজ্জয়িনীর ঠিক বিপ্রতীপে অবস্থান করছে 'ধ্রুবপুত্র'-এর দশার্ণ-উজ্জয়িনী। 'ধ্রুবপুত্র'-এ বর্ণিত উজ্জয়িনী খরার প্রচণ্ড দাহে শুষ্ক। প্রতিটি নদী শীর্ণকায়া, এমনকি নদীর বালি খুঁড়ে জল বের করতে হচ্ছে। অমর মিত্র অত্যন্ত মুন্সীয়ানার সঙ্গে এই ধ্রুপদী কাব্যের বর্ণনাকে তাঁর উপন্যাসে নিয়ে এসেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষিত তৈরি করার জন্যে। ভয়ংকর অনাবৃষ্টির বর্ণনা করতে গিয়ে স্মৃতি এবং বর্তমানের দারুণ বৈষম্য দেখাচ্ছেন কথাকার—

> 'আমার দশার্ণ দেশ এক সুন্দর বাসভূমি, কেতকীর সার দিয়ে ঘেরা। দশার্ণ দেশটি জম্বুবনে শ্যামল, জম্বুবৃক্ষে পরিপক্ক ফল, ওই বৃক্ষেই আবার পাখিরা বাসা নির্মাণ করেছে খড়কুটোয়, কেতকী বনে কুড়ি এসেছে বর্ষার আগমনে, বেত্রবতী ছিল জলপূর্ণ, কী লীলায়িত ভঙ্গি সেই নদীর — এখন জলহীন!
>
> ... বেত্রবতী নদীর তীরেই বিদিশা নগরী। তার উপকণ্ঠে নীচৈঃ পাহাড়। ... পাহাড়ের নির্জনতা তো প্রণয় বিলাসী-বিলাসিনীদের প্রিয় ছিল। নির্জন গিরিগুহায় যুবক-যুবতীরা মিলিত হতো, প্রণয় সম্ভাষণে মুখর করে তুলত দশদিক। সেইসব বিলাসী, বিলাসিনী নারী-পুরুষের দেহের সৌরভে ভরে থাকত নীচৈঃ পাহাড়ের গুহা। এখন দ্বিপ্রহরে শুধু শৃগালেরা ঘুরে বেড়ায় ওই পাহাড়ের কোলে। গুহাগুলি হিংস্র প্রাণীর বাসভূমি হয়েছে। মনে পড়ে বেত্রবতীর নদীর দুই কূলে নববর্ষায় যূথিকার বন গভীর হয়ে যেত। সেই বনে রমণীরা পুষ্পচয়ন করতে আসত। এখন নদীতীর খাঁ খাঁ, শুধু বালি ওড়ে।' [১৯]

অতীতের স্মৃতিচারণ সূত্রে অমর মিত্র ব্যবহার করেছেন 'মেঘদূত'-এ বর্ণিত দশার্ণ। কাব্যগন্ধী আবেশঘন স্মৃতিচারণের বিপ্রতীপে রূঢ় কঠিন বাস্তব। বাস্তব উজ্জয়িনী-বিদিশা সদা-সমৃদ্ধ নগর নয়। জীবন সর্বদা কাব্যের মায়াময় আবেশ নয়। বাস্তব গদ্যের কাঠিন্য, জীবন আসলে সংগ্রামের অপর নাম। উজ্জয়িনী নগরী বর্ণিত হয়েছিল ধরায় স্বর্গখণ্ড হিসেবে 'মেঘদূত'-এ। কিন্তু বিনির্মিত উজ্জয়িনীর কুৎসিত চেহারা আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। ধন এখানে পূজিত হয় সর্বাধিক। জ্ঞানের উর্ধে যখন অর্থের স্থান

নির্ণীত হয়, তখন বুঝতে হবে সেখানকার মূল্যবোধ তলানিতে ঠেকেছে। বর্তমানের এই মূল্যবোধের আকাল অমর মিত্র প্রকাশ করেছেন তাঁর আলোচিত এই আখ্যানে। শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত নিজের ক্রীতদাসকে তৈরি করেছেন নিষ্ঠুর হৃদয়হীন হিসেবে। তাঁর অর্থকৌলীন্য রক্ষা করে তাঁর নিষ্ঠুর দাসকে বারবার অপরাধ করা সত্ত্বেও। আর মূলত সেই অপরাধগুলির পেছনে থাকে তাঁর প্রশ্রয়। তাঁরই আদেশে ধ্রুবপুত্রকে নগরের পথে প্রহার করে দাস উতঙ্ক। এর প্রতিবাদ করার সাহস কারো থাকে না। এমনকি ধ্রুবপুত্রকে শুশ্রূষা করতে চাইলেও রাত নামার আগে কেউ এগিয়ে আসতে সাহস করে না। শূদ্রপল্লীতে অগ্নিসংযোগের পরোক্ষ আদেশ দেন সুভগ দত্ত রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য। উতঙ্ক প্রভুর আজ্ঞায় তাই করে, কিন্তু তাকে শূদ্রপল্লীর অনেকে দেখে ফেলে। ফলে এক বসন্তের দিনে তার ফাঁসির আদেশ হয় রাজার অজ্ঞাতে। তার মৃত্যুতে পথচারীরা এই ভেবে আনন্দ লাভ করে যে এবার থেকে রাস্তা নিরাপদ হল। উতঙ্কের দ্রুতগামী রথ কাউকে পিষ্ট করবে না, কারো হাত পা ভাঙবে না আর তার হাতের চাবুক কারো পিঠে পড়বে না। এ হল ধরাধামের স্বর্গের একটি খণ্ডচিত্র। মনে হয়, এ যদি স্বর্গ হয় তবে মর্ত্য থেকে তার পার্থক্য কোথায়! আমাদের বর্তমান থেকেই বা তার পার্থক্য কোথায়!

লক্ষ্য করার বিষয় হল, 'মেঘদূত'-এর ২৪ থেকে ৪০ তম শ্লোকের প্রায় প্রত্যেকটির বর্ণিত দৃশ্যের এক বিপরীত দৃশ্য 'ধ্রুবপুত্র'-এ তুলে ধরা হয়েছে। গৃহপালিত ময়ূররা বৃষ্টির অভাবে নৃত্য তো করেই না, উপরন্তু তাদের আদর করে কাননে ঠাঁই দেওয়ারও আর উপায় নেই। কারণ বাগান সব শুকিয়ে গেছে। দেবদত্তার বাড়ির পোষা ময়ূরের মৃত্যুর কথা আখ্যানে উপস্থিত। উজ্জয়িনীর আরেক নাম কুমুদবতী, কারণ পদ্ম ফুটে সেখানে প্রচুর। কিন্তু অনাবৃষ্টিতে জলস্তর নেমে যাওয়ায় পদ্মও নেই কোথাও। গ্রামবৃদ্ধরা অবন্তিকা বাসবদত্তা ও বৎসরাজ উদয়নের কথা বলে না 'ধ্রুবপুত্র'-এ, সদ্য যৌবনপ্রাপ্তা গন্ধবতী মহাকবি ভাসের রচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তম'-এর উল্লেখ করে এবং তার গল্প শোনায়। মহাকাল মন্দিরের এবং তার নটীদের মনোগ্রাহী বিবরণের বিপরীতে রয়েছে এক চির অনুচ্চারিত বেদনার ইতিহাস। নগরের নানা স্থান থেকে সুন্দরী নারীদের সংগ্রহ করে দেবদাসী হিসেবে নিযুক্ত করা হত। তাদের অতীত সম্পূর্ণ মুছে ফেলে তারা আসে। যতদিন মন্দিরে অবস্থান ততদিন পুরোহিতের বিকৃত ক্ষুধা মেটানো তাদের কাজ। কারণ — 'ভগবানের প্রতিনিধি, ভগবানের আরেক রূপ হল প্রধান পুরোহিত' (পৃ. ৭৪)। আর তাদের ভবিষ্যৎ বেশ্যাপল্লী।

> 'এই মন্দির অলিন্দের পাথরে মাথা ঠুকে যৌবন ক্ষয় করতেই না তার এখানে আসা। সেইভাবেই তো যৌবন ক্ষয় করে কতজন চলে গেছে নগরীর বাইরে বারাঙ্গনা পল্লীর ক্লেদে। কতজন হয়ে গেছে নিরুদ্দেশ।' [২০]

মন্দিরের পুরোহিত যে হওয়া উচিত মহাকাল শঙ্করের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, সে বিকৃত কামাচারী, বৃদ্ধ

অথচ কামুক, শঠবুদ্ধির অধিকারী। মহাকাল মন্দিরের সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনিকে আড়াল করে দিচ্ছে শীৎকার ধ্বনি। ভক্তিকে ছাপিয়ে যাচ্ছে কাম। যদিও প্রাচীন ভারতীয় মানসিকতায় কাম পাপাচার নয়। তা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের সঙ্গে সঙ্গে একটি শাস্ত্র, একটি কলা। কিন্তু দেবালয়ে দাঁড়িয়ে দেবদাসীকে দেখে শ্রেষ্ঠীর মধ্যে জেগে ওঠা কামভাব 'গোপন শীৎকারে মত্ত' হওয়া নেহাতই আত্মরতি বলে মনে হয়। মিলনের শাস্ত্রসম্মত আচার তো তা নয়।

রাত্রিকালে অভিসারিকাদের বিদ্যুতের আলো জ্বেলে পথ প্রদর্শনের জন্য মেঘকে অনুরোধ করেছিল যক্ষ। আর এ আখ্যানে রাষ্ট্রশক্তির অংশ নরনারীর একটি জৈবিক আচারেও হস্তক্ষেপ করে যেন। উদ্ধব রাতে সুযোগ মতো অভিসারিকাদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেয় অথবা অর্থের অভাবে অন্য প্রকার সুযোগ গ্রহণ করে।

'মেঘদূত'-এর পুনর্বিন্যাস করেই কেবল অমর মিত্র থেমে যাননি, সেই সময়কে নিয়ে গঠিত আরো কয়েকটি মিথকে তিনি বিনির্মাণ করেছেন। বলা হয়ে থাকে গুপ্তযুগে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে শক ও হূণ আক্রমণকে কেন্দ্র করে এবং বিস্তৃত জনপদ একই রাজার শাসনাধীন হওয়ায়। কিন্তু এই যুদ্ধগুলিতে যে-সমস্ত সৈনিক প্রাণ দিয়েছে বা সন্ধানহীন হয়ে গেছে তাদের পরিবারের প্রতি রাষ্ট্র বা রাজা কোনো সম্মান প্রদর্শন করছে না— কোনো আর্থিক সাহায্য প্রদান করছে না। সাহায্য বা অনুদানের কথা তো দূরে থাক হূণ যুদ্ধে হারিয়ে-যাওয়া বীর সেনানী কার্তিককুমারের পরিবার বারংবার অত্যাচারিত হয়েছে দেশের শাসনযন্ত্রের হাতে। রাজকর্মচারী উদ্ধব কার্তিককুমারের কন্যা গন্ধবতীকে বিয়ে করতে চায়। স্বার্থে ব্যাঘাত পড়লে সে অনায়াসে সভ্যতার মুখোশ খুলে ফেলতে পারে। গন্ধবতী অথবা তার মা রেবা বা পিতামহ শিবনাথ উদ্ধবের পরামর্শে সায় না দিলে সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। নিখোঁজ সৈনিকের স্ত্রী এবং কন্যা উভয়কে অশ্লীল কথা বলতেও রাজকর্মচারী উদ্ধবের বাধে না। দেশের জন্য আত্মত্যাগকারী বীর সেনানীর পরিবার রাজকর্মচারীর হাতে নিগৃহীত হলে জাতীয়তাবোধ সেখানে কতটুকু সে-প্রশ্ন আসতেই পারে।

নিঃসন্দেহে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিশাল আয়তন বিশিষ্ট ছিল। কিন্তু সেই বিশাল সাম্রাজ্যের সবাই কি রাজনীতি-রাজা-রাজধানী সম্বন্ধে সচেতন ছিল? রাজধানী থেকে প্রায় পনেরো দিন পায়ে হাঁটা দূরত্বে কালামুখী গাঁও। গ্রামটি নিষাদদের। তারা দেশের নাম জানে না, রাজধানীর নাম জানে না —

'তাম্রধ্বজ বলেছিল, উজ্জয়িনী নগর থেকে আসছি।

কোথায় উজানি,

তোমরা উজ্জয়িনী জাননা?

জানি মনে হয়, আবার জানি যে তাও বলা যাবে না। বলেছিল

বৃদ্ধ নিষাদ।

উজ্জয়িনী অবন্তী দেশের রাজধানী।

অবন্তী দেশ কোথায়?

এই তো অবন্তী দেশ।

তারা মাথা নেড়েছিল, তা হবে কী করে, এটা কালামুখী

ঠাকরুণের কালামুখী গাঁও, কালামুখী দেশ, অবন্তী দেশ

হবে কেন?' [২১]

এরা কি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটা দেশবাসী হতে পারে? নিশ্চয়ই না।

এই সময় ভারতবর্ষে জ্যোতির্বিদ্যা প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল। রাজ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান পঠন পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। সাধারণ নগরবাসীরাও নক্ষত্র চিনত, তাদের অবস্থান ঘটনা ও সময়ের স্মারক হিসেবে মনে রাখত। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্র দুটি মিশিয়ে দেওয়া হয়। ফলে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থানের গণনা করে ভবিষ্যৎ বলার প্রথা মানুষকে প্রভাবিত করে। এ প্রথা খারাপ কি ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়া এ স্থানে অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু দেশের রাজা যদি অনাবৃষ্টির সময় জনগণের হিতার্থে কোনো প্রচেষ্টা না করে গ্রহনক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন বৃষ্টি আসার, সব সমস্যার সমাধানের, তাহলে সেটা রাজার অক্ষমতা যেমন প্রকাশ করে তেমনি অতিরিক্ত ভাগ্যবাদ যে ভারতবাসীর বারবার পতনের কারণ হয়েছিল তাও মনে করিয়ে দেয়। অথচ ভারতবর্ষেই উচ্চারিত হয়েছিল গীতার বাণী। যেখানে কর্মযোগকে যথোচিত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং ভাগ্যবাদকে অস্বীকার করা হয়েছে। গীতাই তো শুনিয়েছে—

ন কর্মণামনারম্ভ্য নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।।৪।।[২২]

অমর মিত্র এভাবে বারবার ভেঙে দিয়েছেন হিন্দু শাসিত ভারতবর্ষ নিয়ে গড়ে ওঠা পুরাকথাগুলিকে। প্রায় সব পেয়েছির দেশ হিসেবে বর্ণিত হয় প্রাচীন ভারতকে। সাধারণ জনগণের জীবন ঐতিহাসিকরা খুব একটা মর্যাদা এবং গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা কখনোই করেন না। আর যদি তাঁরা তা করতেন তবে কখনই ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুবর্ণযুগ বলে কোনো যুগই হয়ত স্বীকৃতি লাভ করত না। বিশেষত কঠোর বর্ণাশ্রম যেখানে মান্য এবং পুরুষতন্ত্রের যেখানে জয়জয়কার সেখানে সবাই সুখে-আনন্দে আছে তা কি মেনে নেওয়া যায়!

ছয়

ইতিহাসকে যেমন বিনির্মাণ করেছেন অমর মিত্র তেমনি এই আখ্যানে তিনি ঐতিহ্যের নবনির্মাণও করেছেন। ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি সমূহের একটি প্রাচীনতম মিথ এই আখ্যানে ব্যবহৃত হয়েছে। অনাবৃষ্টির কারণ হিসেবে রাজ্যের রাজার সন্তানহীনতা বিশেষত পুত্রহীনতাকে দায়ি করার নিদর্শন আমরা পেয়েছি আদিকবির লেখায়। রামায়ণে সন্নিবিষ্ট হয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ও অঙ্গরাজ লোমপাদের কাহিনি। অঙ্গদেশে একবার রাজার কোনো দোষে ভয়াবহ অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। সেই অনাবৃষ্টি থেকে রাজ্যকে বাঁচানোর জন্যে অঙ্গরাজ লোমপাদ নারী সম্পর্কে অজ্ঞাত বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজ্যে আনয়ন করেন এবং তার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে দীর্ঘদিনের চলতে থাকা অনাবৃষ্টি শেষ হয়, অবিরলধারায় বৃষ্টি নামে। তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় রাজকুমারী শান্তার। দেশে সমৃদ্ধি ফিরে আসে। এই আখ্যানের বর্ষণহীনতার জন্যে রাজা ভর্তৃহরি ও ভানুমতীর সন্তানহীনতাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। দেবদাসী ললিতা ও রাজা ভর্তৃহরির মিলন ও তার কিছুদিন পর ললিতার ঋতুমতী হওয়ার খবর মহাকাল মন্দিরের পুরোহিত ও সুভগ দত্তকে সুযোগ করে দিয়েছে আরো একটা সহজ সমীকরণে পৌঁছানোর। রানি নয় রাজা অক্ষম এই উপসংহারে পৌঁছে দিয়েছে পুরোহিতকে —

> '...এতে প্রমাণ হলো রাজার সেই ক্ষমতা নেই, একজন অক্ষম পুরুষ বসে আছেন উজ্জয়িনীর সিংহাসনে, রাজার যদি সন্তান সৃজনের ক্ষমতা না থাকে, ফসল হবে কেন, বৃষ্টিই বা নামবে কেন, রানী যতবার গর্ভবতী হবেন, ততবার সম্পদে ভরে উঠবে দেশ, রাজা সিংহাসনে থাকতে আর বৃষ্টি হবে না এদেশে।' [২৩]

জ্যোতির্বিদ বৃষভানু রাজা এবং দেবদাসীর মিলনকে বৃষ্টি নামানোর এক প্রচেষ্টা হিসেবে বর্ণনা করেছেন কালামুখী গ্রামের মানুষের কাছে। সেইসঙ্গে সুভগ দত্তের ক্রীতদাস উতঙ্কের আগুনে পুড়িয়ে হত্যার শাস্তি-কাহিনিও বৃষভানু বৃষ্টি আনার প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন। নিষাদ গ্রামবাসীরা এই কথাগুলো বিশ্বাস করেছে কারণ সু-ফসলের জন্যে বলি এবং যৌনাচার ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। 'নরবলির ইতিহাস' গ্রন্থে দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

> 'মানুষ যখন ক্রমে কৃষি নির্ভরশীল হলো, জমির ফসল ও ফসলজাত সামগ্রী হয়ে উঠলো তার প্রাণ ধারণের অন্যতম উপায়, তখন ফলবতী জমির সঙ্গে সন্তানবতী নারীর একটা অভিন্ন সাদৃশ্য খুঁজে পেল মানুষ। অতঃপর ফসল

> নির্ভরশীল মানুষ খরা, বন্যাজনিত দুর্বিপাকে, ফসলহীনতাকালে সে তার পূর্ব সংস্কার আরেকবার প্রয়োগ করলো 'অলমাইটি'-এর উদ্দেশ্যে। যেহেতু নারী ও তার যৌনশক্তির মধ্যে ফলবতী জমির সাদৃশ্য পেয়েছিল মানুষ, তাই 'বিষে বিষক্ষয়'-এর মতো নারীর উৎপাদন ভূমি (যোনি) কর্ষিত সামগ্রী (ধর্ষণের দ্বারা নিঃসৃত শোণিত) অজানা শক্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে মানুষ তার জীবনদায়ী কৃষিভূমিকে অধিক ফলবতী করতে চাইলো।' [২৪]

হোলি বা হোলক ছিল আদিতে অনার্যদের উৎসব এবং সম্পূর্ণই কৃষিসমাজের পূজা। সুশস্যের কামনায় জমির উদ্দেশ্যে নরবলি দেওয়া হত। তারপর নিহত লোকটির রক্ত গায়ে মেখে এবং অপরকে মাখিয়ে যৌনলীলাময় নাচগানের মাধ্যমে এই ফসল উৎসব পালন করা হত। অর্থাৎ সুশস্যের কামনায় শস্যক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মিলন ও নরহত্যা দুই-ই কৃষিসমাজে স্বীকৃত ছিল। উপরন্তু অনার্যসমাজে রীতিটির প্রচলন অধিক ছিল। তাই গ্রাম প্রধান বৃদ্ধ নিষাদ রাজা ভর্তৃহরি ও দেবদাসী ললিতার মিলন ও উতঙ্কের মৃত্যুর কথা শুনে তাম্রধ্বজকে প্রশ্ন করে —

> '... দাসের মৃত্যুর পরও পানি নাই, সুলক্ষণা দেবদাসীর সঙ্গে রতিকর্মেও পানি নাই।
> ...
> যুবতী সুলক্ষণা কি ছিল না?
> কে বলেছে?
> তা হলে পানি নাই কেন?
> কী বলছ তুমি?
> বৃদ্ধ নিষাদ বলে, ওভাবে পানি আসে, তবে আমাদের মিলন হয়
> জমিনে, ফসলের ক্ষেতে, সেই যুবতীকে হতে হবে অক্ষত,
> পুরুষকেও হতে হবে শুদ্ধ, কোনো মেয়েমানুষকে
> যে ছোঁয়নি এ পর্যন্ত— রাজার কি বিবাহ হয় নাই?
> ...
> ... রাজা যদি শুদ্ধ না হন, রতিক্রিয়া করে থাকেন আগে, তবে
> কী করে আকাশে পানি আসে, আর যুবতীকে নিয়ে
> যাওয়া উচিত ছিল ফসলের জমিনে, মন্দিরে কেন?

জানি না।

মানুষ যদি দিলে, তবে তার রক্ত ছিটায়ে দিলে না কেন জমিনে,

তাতে বৃষ্টি আসতই, পোড়ানোর কথা কে বলেছিল?' [২৫]

রামায়ণ অথবা মহাভারত কিংবা ইলিয়াড বা ওডিসি প্রতিটি মহাকাব্যে যে যুদ্ধের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তার পেছনে নারীর রূপের প্রতি পুরুষের তৃষ্ণা এক প্রধান কারণ। রাম এবং রাবণের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সীতা হরণের ফলে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পেছনে দ্রৌপদীর পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে মনে করা যেতে পারে কুরুবংশ ধ্বংসের জন্য আয়োজিত যজ্ঞ থেকে যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর জন্ম। ট্রয়যুদ্ধের কারণ মেনেলাস পত্নী রূপসী হেলেনের ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিসের দ্বারা অপহরণ। ওডিসিউসের পত্নী পেনেলোপির পাণিপ্রার্থীদের সঙ্গে ওডিসিউসকে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর লড়াই করতে হয়। রূপবহ্নির দহনের কাহিনি এই চারটি মহাকাব্য, বলা যেতে পারে। আলোচ্য আখ্যানেও এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। উতঙ্কের জীবন্ত অগ্নিদাহের পর শ্রেষ্ঠী সুভগ দত্ত প্রথমবারের মতো অন্যের দুঃখে, কষ্টে, মরণে দুঃখী হয়েছেন। একাকী দাঁড়িয়ে উতঙ্কের প্রেতাত্মার আদলে যেন নিজের বিবেকের মুখোমুখি হয়েছেন। চিন্তাসূত্রে বেরিয়ে এসেছে সুভগ দত্ত কেন রাজা ভর্তৃহরির সিংহাসনচ্যুতির জন্যে প্রচেষ্টারত। কারণ দেবদত্তা সুভগ দত্তকে ফিরিয়ে দিয়েছে নিজেকে রাজার অনুরাগিনী জানিয়ে। তাই সুভগ দত্ত চান রাজাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেবদত্তার অহংকার ভাঙতে। তিনি ধ্রুবপুত্রকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন কারণ সে দেবদত্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। সুভগ দত্তের চিন্তায় ফুটে উঠেছে রূপবহ্নিতে নিরন্তর পুড়ে পুড়ে চতুর্দিকে সেই আগুন লাগিয়ে দেওয়ার কাহিনির সংক্ষিপ্ত রূপ—

> 'রমণীবিহীন পুরুষমানুষ বাঁচে কী করে? জীবনের যত আস্বাদ সবই তো স্ত্রীলোক। তাঁর নিজের স্ত্রী আছে, সন্তান আছে, কিন্তু দেবদত্তা ব্যতীত এ জীবন যেন রোদে পুড়ে যায়, অঙ্গার হয়ে যায় পুড়ে পুড়ে। অথচ স্ত্রীলোকই যে ধ্বংসের কারণ তা টের পাওয়া যাচ্ছে এখন। দেবদত্তার জন্য ধ্রুবপুত্রকে তিনি দূর নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। হায় ধ্রুবপুত্র! ... সব ওই গণিকার জন্য। রূপে পোড়ায় যে আমাকে দিনরাত্রি।' [২৬]

অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয় খরাকে বাদ দিয়ে মনুষ্যকৃত যে বিপর্যয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার পেছনে একটা কারণ অবশ্যই নারীর রূপ। কেবল সুভগ দত্ত নয়, ভর্তৃহরির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আরেক প্রধান শরিক কুমার বিক্রমসেনও নারীর রূপের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। রাজ-সিংহাসন ছাড়াও রানি ভানুমতিকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাকে ষড়যন্ত্রে প্ররোচিত করেছে।

'... সেনাপতি দাস হয়েছে রানীর, রানী ভানুমতির জন্য সেনাপতি সিংহাসন চায়, সিংহাসন আর নারী এক হয়ে যায়...।' [২৭]

সাত

'... সময়ের ছায়া না নিয়ে কোন রচনাই বা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠতে পারে। সময় তো কতগুলি সন তারিখের পর্যাপ্ত ব্যবহার নয়, সময় তো কতগুলি ঘটনাক্রম নয়। সময় তার ছায়া ফেলে করোটির অন্ধকারে। সেই অন্ধকারই কি আঁকা হয় আখ্যানে?' [২৮]

রবিশংকর বল-এর উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অমর মিত্র লিখেছিলেন— 'যে জীবন ফড়িঙের দোয়েলের' নামক প্রবন্ধে। সময়ের যথার্থ চেহারাকে আখ্যানে ধরাই ঔপন্যাসিকের কাজ। আমরা আগেও উল্লেখ করেছি, আখ্যানের বাস্তব মানে 'যা ঘটেছে'-র সঙ্গে 'যা ঘটতে পারে'। আর উপন্যাসের কাহিনির সময় যাই হোক না কেন সেখানে আখ্যানকারের নিজস্ব সময়ের ছাপ থাকবেই। 'ধ্রুবপুত্র'-এর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বর্তমান সময়ের নানা অনুষঙ্গ। বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক-সামাজিক হরেক ঘটনা, পরিস্থিতির ছায়া বিস্তৃত হয়েছে প্রাচীন সময়ের প্রেক্ষাপটে। আজকের এই সময়ে আমরা দেখি যে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও রাজনৈতিক নেতাদের ভোটবাক্সের হিসাব নিকাশে কীভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তা নিয়ে সংবাদপত্রে সংবাদ তৈরি হচ্ছে। আর কেবল সংবাদ তৈরিই তো হয় না, সেরকমটাই তো ঘটে থাকে। আবার অনেক সময় নিজেদের দলের অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা মিথ্যা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেন এবং পরে জনগণের সহায়তা করার ভান দেখিয়ে নিজেদের পাল্লা ভারি করেন। এই জাতীয় ঘটনার প্রতিরূপ আখ্যানে সুভগ দত্ত, পুরোহিত ও বিক্রম সেনের কীর্তিকলাপের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। এরা প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন। আর সেই চক্রান্তে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেছেন তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে চলা অনাবৃষ্টিকে। অনাবৃষ্টিকে কেন্দ্র করে প্রজাদের মধ্যে জেগে ওঠা অসন্তুষ্টিকে চক্রান্তকারীরা ঘুরিয়ে দিয়েছে রাজার দিকে। ফলে একসময় প্রজারা বলতে শুরু করেছে রাজার দোষে বৃষ্টি হচ্ছে না। এমনকী গুজব রটানো হয়েছে আকাশে একটি নতুন তারার উদয় হয়েছে। সেই তারার প্রভাব পড়তে শুরু হয়েছে। কেবল গুজব রটিয়ে তো বড়ো কোনো

অদল-বদল আনা যায় না, আর অনাবৃষ্টি তো সম্পূর্ণই প্রাকৃতিক — এর দ্বারাও খুব বেশি সুবিধা হয় না। ফলে, এবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—

> ‘শূদ্রর ঘরে আগুন লাগান আগুন, আগুন। আগুন ছাড়া কোনো উপায় নেই,
> পুড়িয়ে দিন শূদ্রপল্লী, হা হা রবে ভরে যাক নগর...।’ [২৯]

ক্রীতদাস উতঙ্ক শূদ্রপল্লীতে আগুন লাগায়। উতঙ্ক যাকে সুভগ বাল্যাবস্থায় পাহাড় অঞ্চল থেকে কিনে এনে গড়ে তুলেছিলেন নিষ্ঠুর নির্মম করে, সে সুভগ দত্তের সব আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করে। শ্রেষ্ঠীর নির্দেশে সে আগুন লাগায় কিন্তু নির্দেশ না থাকায় সে আত্মগোপন করার কোনো চেষ্টা করে না। তাকে শূদ্রপল্লীর অনেকে আগুন লাগানোর সময় দেখে নেয়। উতঙ্ককে বন্দী করা হয়। কিন্তু তার অপরাধ এবং বিচারের কথা রাজাকে না জানিয়েই খুব দ্রুত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে অগ্নিদগ্ধ করে মারা হয়। কারণ উতঙ্ক কেন হঠাৎ শূদ্রপল্লীতে আগুন দিল— এই প্রশ্ন প্রথমেই উঠবে এবং কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা প্রচুর। ফলে দ্রুত বিচার এবং শাস্তি দুই-ই সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ রুই কাতলা ধরা পড়ল না চুনোপুঁটি বেঘোরে মারা পড়ল। এমন দৃশ্য বর্তমানেও তো কত দেখি আমরা, দেখতে দেখতে চোখ সয়ে গেছে। অমর মিত্র যখন লেখেন— ‘শূদ্র ঘরে আগুন দিলে শূদ্রই মরে’ (পৃ. ১৬০) তখন আমার সুপ্তপ্রায় বিবেক বুদ্ধি যেন জেগে ওঠে, সচকিত হয়ে লক্ষ করি ‘গরীবের’ ঘরে আগুন দিলে ‘গরীব’ই মরে।

রাজকর্মচারী উদ্ধবের ক্ষমতা হাতে থাকায় সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালায়, নিরুদ্দেশ সৈনিক পরিবারের প্রতি দুর্ব্যবহার করে। আবার তার থেকে ক্ষমতাশালী ব্যক্তির নির্লজ্জ চাটুকারিতা করে — যা আমাদের এ সময়ে সহজলভ্য দৃশ্য। ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীর প্রত্যেকে নিজেদের প্রাণের বিনিময়েও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং বারবার বিভিন্ন যুদ্ধে তারা প্রমাণ করেছে এ প্রতিজ্ঞা নিছক বলার জন্যে বলা নয়। কিন্তু অবিমিশ্র ভালো বোধহয় কোনো কিছুই হয় না। তাই মণিপুরের মনোরমা ধর্ষিতা ও নিহত হয় আসাম রাইফেলসের জওয়ানদের দ্বারা। আর দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, এটি সংবাদে এসেছে, আরো এ জাতীয় ঘটনা ঘটে চলেছে যেগুলো সংবাদ শিরোনামে স্থান পায় না, চাপা পড়ে যায়। কিন্তু সব ঘটনা কি পুরোপুরি চাপা পড়ে যায়? অনুভবী কথাকারের কলমে নয়তো কেমন করে উঠে আসে—

> ‘... সেনাবাহিনীতে বীর সাহসী সৈনিকরা যেমন থাকে, তেমনি থাকে লোভী, কুচক্রী, দুরাচারীরা, অস্ত্রের ক্ষমতা ভীষণ ক্ষমতা, অস্ত্রের অহংকার ভীষণ অহংকার, সেই অহংকারে রাজকর্মচারী, সেনাবাহিনী অত্যাচারী হয়ে ওঠে,

উদ্ধবদাসকে দ্যাখেননি আপনি? ... আমি দেখেছি তো বণিকের সর্বস্ব লুট করে ভাগের জিনিসপত্র নিয়ে আবার কলহে মত্ত হয়েছে সৈনিকের দল, তাদের অধিনায়কই এসব কাজে তাদের উদ্বুদ্ধ করে, নারী অপহরণ করে না সেনাবাহিনী?' [৩০]

কুমার বিক্রমসেনকে প্রথম সিংহাসনের নেশা লাগিয়ে দেন সুভগ দত্ত। যে বীজ সুভগ দত্ত রোপন করেছিলেন তাতে জলসিঞ্চন করেছেন মহাকাল মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। ধীরে ধীরে মহাসেনাপতি রাজানুজ বিক্রমকে সিংহাসন লিপ্সা সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিয়েছে। ফলে জনগণের সুখদুঃখ এখন আর তাঁর কাছে গ্রাহ্য নয়। শূদ্রপল্লীর জনগণ নিজেদের প্রচেষ্টায় সরোবর খুঁড়ে জল তুলেছে। সেই জলের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন তিনি। শহরময় ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছেন মিথ্যা গুজব। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে ধর্ম, অর্থ ও সুবিধার আঁতাত আজও আছে, কালও ছিল আর যদি সাধারণ মানুষের বোধোদয় না হয়, তবে আগামীতেও থাকবে— ভারতবর্ষের এই ভবিতব্য। এই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয় নিষ্পাপ দেবদত্তা। গুজব ছড়িয়ে যায় রাজা নগরের শ্রেষ্ঠ নটীকে ধর্ষণ করে হত্যা করেছেন। যারা যথার্থ হত্যাকারীকে চিহ্নিত করতে পেরেছিল, তাদের জীবনও প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি হয়ে যায়। নিজের জীবন বাঁচাতে তারা নগর ত্যাগে বাধ্য হয়।

'ধ্রুবপুত্র' আখ্যানে সেই সময়ের ছবি আঁকা হয়েছে যখন ভারতে শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। মেঘের প্রকার অনুযায়ী তাদের শ্রেণীবিভাগ করে নাম দিয়েছে আলাদা। বাণিজ্য সূত্রে বহির্ভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। আবার এই ভারতবর্ষেই এই সময়ই নারী এবং শূদ্রকে রাখা হয়েছে অপাংক্তেয় করে। রানি ভানুমতি কিংবা দেবদত্তা উভয়েই সুশিক্ষিতা। নৃত্য-গীত-দর্শন-কাব্যচর্চা নটীরা করত — তাদের পেশাগত লাভালাভের কারণে। আর রাজপরিবার ও ধনীগৃহেও হয়তো এই বিষয়গুলির চর্চা হত। কিন্তু বৈদিক যুগে যেমন মৈত্রেয়ী, গার্গীর ন্যায় স্বল্পসংখ্যক হলেও বিদূষী মহিলার নাম পাওয়া যায়, 'ধ্রুবপুত্র'-এ তেমনটা নয়। এখানে নারীদের শিক্ষা জ্ঞানের বিস্তারের জন্যে নয়, পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্যে। আর সাধারণ নারীদের অবস্থা অকহতব্য। প্রৌঢ় ধনী অনায়াসে বিবাহ করতে পারে রূপসী তরুণীকে। আবার নিজের অক্ষমতার দায়ভাগ সম্পূর্ণ চাপিয়ে দেয় স্ত্রীর ঘাড়ে। ঘরোয়া অপরাধের (Domestic violence) এর এক করুণ ছবি ফুটে ওঠে প্রৌঢ় ও তরুণী-বধূর দাম্পত্য জীবনের কাহিনিতে। হয়তো অর্থকৌলীন্য ভেদে নারীরা অল্পবিস্তর পৃথক অধিকার পেয়েছে কিন্তু পুরুষতন্ত্রের মূলমন্ত্র— '... মেয়েমানুষের দাসীই বা কী রানীই বা কী' (পৃ. ১৪১) ভাবনাটি সবারই মনের কোণে রয়ে গেছে। স্বয়ং রানি ভানুমতি রাজা এবং দেবদাসী ললিতার সম্বন্ধে জানতে পেরে সেনাপতি বিক্রম সেনকে বলেছেন—

'... আমার বুক ভেঙে গেছে, মুখ দেখাব কোথায়, লোকে যে বলছে আমি অক্ষম বলে রাজা অন্য নারীতে গেছেন, পুরুষ মানুষের কি পাপ হয় কুমার?' [৩১]

তারপরের পঙ্‌ক্তির বক্তব্যটি আরো লক্ষণীয়—

'সেনাপতি চুপ করে থাকলেন। আজন্ম লালন করা সংস্কার তাকে বলতে দিল না পাপীর নারী-পুরুষ ভেদ নেই, পুরুষেরও হয়, যেমন নারীর হয়ে থাকে।' [৩২]

আজকের ভারতবর্ষ নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করেছে, নারীর সমানাধিকার আইন স্বীকার করেছে, কিন্তু আইনের স্বীকৃতি আর সমাজের মেনে নেওয়া কি এক হয় কখনো? চরিত্রের শুদ্ধতা আজও মেয়েদের বিচারের প্রধান মাপকাঠি। ছেলেদের ক্ষেত্রে অন্যান্য গুণাবলীর সঙ্গে একটি মাত্র, কিছু বিশেষ নয়। পুরুষতন্ত্রের ধারক বারাঙ্গনা চতুরিকার মুখে অমর মিত্র বসিয়েছেন—

'... মেয়েমানুষের অহংকার কিসে হয়, পড়ে থাকে তো পুরুষমানুষের নীচে ...'[৩৩]

আর এই সময়ের আধুনিক এক চরিত্রের মুখে সুচিত্রা ভট্টাচার্য বসিয়েছেন—

'হুঁ হু বাবা যতই তূণীরকে খোঁচাও আর ঝিনুককে গ্যাস দিয়ে বাচেন্দ্রী পাল করে তোলো, একটা কথা ভুললে চলবে না, বিছানাতে ঝিনুক তূণীরের নীচেই থাকবে।' [৩৪]

প্রায় একই কথা, অর্থাৎ সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও পুরুষতন্ত্রের মূল মন্ত্র একই রয়ে গেছে। সম্ভবত পুরুষতন্ত্রের অবসান না হওয়া পর্যন্ত এই কথাগুলো একই রয়ে যাবে।

আট

আর্যরা ভারতে বিজয়ী জাতি হিসেবে প্রবেশ করেছিল, অনার্য জাতিরা তাই আখ্যায়িত হল 'দাস' হিসেবে। প্রাথমিকভাবে 'দাস' ও 'শূদ্র' পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হলেও ধীরে ধীরে প্রায় সমার্থক হয়ে উঠল। প্রায় সমস্ত কায়িক পরিশ্রমকারীরা প্রবেশ করল শূদ্রের দলে। আধুনিককালে কায়িক পরিশ্রমকারী নিম্নবিত্ত

মানুষদের রাখা হয় নিম্নবর্গের দলে। শূদ্রদের অবস্থা প্রাচীন ভারতে কেমন ছিল তার উদাহরণ সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলিতে ছড়িয়ে আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে শূদ্ররা 'যথাকামঃ বধ্যঃ'। 'মনুসংহিতা'য় মনু বিধান দিয়েছেন শূদ্র যদি কোনো ব্রাহ্মণের নাম ও জাতি অবজ্ঞার সঙ্গে উচ্চারণ করে তবে দশ আঙুল লম্বা একটি গরম লৌহশলাকা তার মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। শিশুদের নামকরণের ক্ষেত্রে মনুর বিধান হল, ব্রাহ্মণের নাম হবে মঙ্গলবাচক, বৈশ্যের ধনবাচক, ক্ষত্রিয়ের বলসূচক এবং শূদ্রের ঘৃণাসূচক নাম হতে হবে। কোনো শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণের শূদ্রাগমনের ক্ষেত্রে নিষেধ করেন অথবা মানা করেননি শূদ্রানী বিবাহের ক্ষেত্রে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও শূদ্রানীর পুত্রকে 'পরাশব' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই জাতীয় সন্তানেরা পিতৃ সম্পত্তির অধিকারী হত না। ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের এ জাতীয় নিষ্ঠুর বর্ণাশ্রম প্রথার জন্য শূদ্ররা জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল।

কালিদাসের 'রঘুবংশ' নাটকে রাম কর্তৃক শূদ্র শম্বুকবধের প্রসঙ্গ এসেছে। কালিদাস রামের এই কাজকে সমর্থন করেছেন কারণ শূদ্র হয়ে যজ্ঞ করা শম্বুকের স্বধর্ম লঙ্ঘন করা তাই তার বধ ন্যায়সঙ্গত। আবার 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এ যে ধীবর মাছের পেট থেকে শকুন্তলার আংটি পেয়েছিল তার বৃত্তিকে নিয়ে নগরকোটাল উপহাস করেছে, তার কথায় অবিশ্বাস করেছে। শূদ্রদের এই অবস্থা অমর মিত্র তাঁর আখ্যানে তুলে ধরেছেন। দেখিয়েছেন শূদ্রপল্লীর নাম শুনলে কীভাবে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মুখমণ্ডলে ঘৃণার ভাব জেগে ওঠে। যাদের স্বাধীন মতামত থাকলে লাঞ্ছিত করা হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে বলা হয়—

> '... শূদ্র এবং নারী, দুই জাতিরই কোনো ক্ষমতা নেই, দুই জাতিই মনুষ্যেতর প্রাণীর মত অবলা ...।' [৩৫]

অথবা—

> 'নারী এবং শূদ্রের ইচ্ছা অনিচ্ছার দাম কী? শূদ্রের জন্ম যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের দাসত্ব করতে নারী জন্ম তো পুরুষের ভোগ্যা হতে। সমস্ত নারীই যেন শূদ্রাণী। শূদ্রকে স্পর্শ করা যেমন অশৌচ কর্ম, শূদ্রাণীকে ভোগ করা তা নয়।' [৩৬]

আজও ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে বর্ণাশ্রমের বাঁধন এতটাই কঠিন, যে অনুলোম-প্রতিলোম প্রণয় এবং পরিণয় অনেক সময় সম্মান রক্ষার্থে হত্যায় (honour killing) সমাপ্তি লাভ করে। অনেক রাজ্যে কোনো কোনো বিশেষ মন্দিরে শূদ্রের প্রবেশ নিষেধ। শালগ্রাম শিলা আজও নারী এবং শূদ্রের ছোঁয়া নিষেধ। তবে এখন হয়তো শূদ্র শব্দটা ঠিক যথাযথ নয়, নিম্নবর্গ অথবা ব্রাত্য অথবা প্রান্তিকায়িত বললে হয়তো যথার্থ হয়। কারণ ভারতবর্ষের সংবিধান এবং প্রশাসন ব্যবস্থা শূদ্রজাতির উন্নতিকল্পে নানা প্রকল্প

হাতে নিয়েছে। আর এই প্রচেষ্টা একবারে অসফল বললে ভুল বলা হবে। কিন্তু শূদ্র না বলে যদি গরীব নিম্নবর্গীয় বলি তা হলে অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন সমাজের একটি ঝলক আমরা বর্তমান সময়েও দেখে নিই। প্রত্যন্ত গ্রামের নিম্নবিত্ত মানুষগুলি আখ্যানে বর্ণিত শূদ্রদের চেয়ে কতটা ভালো আছে তা অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। তবে উত্তর অনুমান করা খুব কঠিন নয় যে অবস্থা হবে প্রায় একই। যদিও এখন হয়তো কেউ সরাসরি 'যথাকামঃ বধ্যঃ' বলে যেখানে সেখানে খুন করবে না কিন্তু সতীদাহ যেমন পণের জন্য বধূহত্যায় পরিণত হয়েছে, তেমনি সরাসরি নরহত্যা গ্রহণ করেছে নানা ছদ্মবেশ। বড়োলোকের সন্তানের মদ খেয়ে ফুটপাতে শায়িত মানুষের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেওয়া অথবা নানা ছোট ছোট রাজ্যের দাবিতে অহেতুক গোষ্ঠীদাঙ্গা যাই হোক না কেন উচ্চবিত্ত উপরতলার লোকেরা খুব কমই প্রভাবিত হয়। রাজায় রাজায় যুদ্ধে উলুখাগড়ার প্রাণই যায়।

তবে পীড়ন কখনোই শেষ কথা হয় না, হতে পারে না। অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চিরদিন হয়েছে এবং হবে। প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ যদি নাও হয় তবু পরোক্ষ প্রতিবাদ। শ্রেষ্ঠীর আজ্ঞায় মেরে রক্তাক্ত করা ধ্রুবপুত্রকে কেউ সাহস পায় না শুশ্রূষা করার। তবু উতঙ্কের ভয় থাকা সত্ত্বেও শূদ্রপল্লীর লোকেরা তাকে আশ্রয় দেয়, বাঁচিয়ে তোলে সেবা শুশ্রূষা করে। তারাই দাঁড়ায় অনাবৃষ্টির বিরুদ্ধে। সপ্ত সাগরা উজ্জয়িনীর সাত সরোবরের জল দারুণ দহনে শুকিয়ে গেছে। তারা সরোবর খোঁড়ে পাতালের জল তোলার জন্য। বৃদ্ধ পরাশর বলে—

> 'যদি জল ওঠে, সবার মঙ্গল, শুধু শূদ্রজাতি একা বাঁচবে না, উজ্জয়িনীর সবাই বাঁচবে!' [৩৭]

আখ্যানের শেষের দিকে ধ্রুবপুত্রের সঙ্গে রাজা ভর্তৃহরির একান্তে হওয়া আলাপে ধ্রুবপুত্র রাজাকে বলে যে সে যাওয়ার পথে যা দেখেছিল, আসতে আসতে সব বদলে গেছে। সে আগে দেখেছিল শস্য শ্যামলা মাটি, সবুজ পৃথিবী, শুনেছিল রাজার গুণগান। আসার পথে দেখেছে দগ্ধ মাটি, দগ্ধ পৃথিবী আর শুনেছে রাজার নিন্দা, শুনেছে এক নতুন তারার জয়গান। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় 'ধ্রুবপুত্র ঙ্খ একজন পাঠকের কাছে' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন—

> 'সে শাসককে, নানা ষড়যন্ত্রে, দ্বন্দ্বে বিক্ষত শাসককে, আকাশে যে নতুন তারা ফোটে তার কথা বলে। সে ফেরার পথে, গ্রামে গ্রামে মানুষের কাছে শুনেছে সেই তারার গুণগান আর রাজার নিন্দা। রূপকের আবরণ প্রায় খুলে যায়, এই নতুন তারা কারা, এ তো আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। তারাকে তো আমরা রূপান্তরের স্বপ্নের পতাকায় এঁকে দিই। রাজাকে, শাসককে, কর্তৃত্বের কেন্দ্রকে ভিনদেশির এই নক্ষত্র দেখানোর মধ্যে কোথায় যেন থেকে যায়

> রবীন্দ্রনাথের নাটকের রাজাদের গল্প। কিন্তু ভিনদেশি রাজাকে ঐ তারার কথা বলে না। সে জানে ঐ তারার কথা রাজা বুঝবে না, বুঝলেও তাকে মেনে নিতে পারবে না। সে বোঝায় রাজার বৈমাত্রেয় অনুজ নতুন তারা, যে রাজ্যকে রক্ষা করতে সিংহাসন অধিকার করবে।' [৩৮]

নগরবাসীকে ধীরে ধীরে বোঝানো হয়েছে রাজার পাপেই দেশের এই অবস্থা। জনগণ বৃষ্টি চায়, সমৃদ্ধি চায় তাই রাজার অপসারণ চায়। ভাবে রাজা বদলে গেলে হয়তো সুদিন আসবে। আমরা এই বিকৃত গণতন্ত্রের দেশে বসে দলবদলে ভাগ্যবদলের স্বপ্ন দেখি। অমর মিত্র এভাবে প্রাচীন সময়ের প্রেক্ষাপটে লেখা আখ্যানের কোষে কোষে সঞ্চারিত করেছেন নতুন সময়ের প্রাণ।

নয়

অমর মিত্র তাঁর যে-কোনো আখ্যানে ভারতীয় পরম্পরা ও স্বভাবকে সময়োচিতভাবে পুনর্বিন্যস্ত করেন। মনে রাখতে হবে, আজকের বিশ্বায়নের সময়ে বসে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগ না রেখে কেবল নিজের প্রাচীন পুঁজিটুকু আঁকড়ে বসে থাকলে তার মানে দাঁড়াবে আমরা সেই কাপুরুষ যারা পিতৃপুরুষের খোদাই করা কূয়ার পানের অযোগ্য জল পান করে চলেছি। আবার মাটিতে প্রোথিত শিকড়হীন হয়ে যাওয়াও কাম্য নয়। নিজস্ব ঐতিহ্য-পরম্পরার সঙ্গে চাই বিশ্ববীক্ষা। প্রতীচ্যের ঔপন্যাসিক আকল্প সম্বন্ধে সচেতনতা এবং দেশজ কথকতার ঘরানার প্রতি নিবিড় ভালোবাসার মিশ্রণ অমর মিত্রের প্রতিটি আখ্যানের বৈশিষ্ট্য।

ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা, যা কয়েক দশক ধরে এশিয়া-আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে আধুনিকতাবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, অমর মিত্রের আখ্যানেও তা এসেছে। কিন্তু তিনি কখনোই উপাদানটিকে চিন্তাশূন্যভাবে ব্যবহার করেননি। যাপিত জীবন থেকে গ্রহণ করেছেন জীবনকে দেখার এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। সেখানে বিশেষ কোনো ফর্ম প্রধান নয়। যা তিনি দেখেন তা দেখানোর জন্যে ব্যবহৃত হয় নানা আঙ্গিক।

সুভগ দত্তের সঙ্গে অন্ধকার রাতে কথা হয় মৃত উতঙ্কের। বাস্তব থেকে জেগে ওঠে অধিবাস্তব। কিন্তু এ তো বাস্তবকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন নয় বরং ভালো করে বাস্তবকে দেখা। বাস্তবে কখনো কোনো মৃত ব্যক্তি

এসে কথা বলবে না কিন্তু এই মিথ্যা সুভগ দত্ত এবং পাঠককে সত্যভ্রম থেকে পৌঁছে দিচ্ছে সত্যে।

আবার কখনো অমর মিত্র আখ্যানে ব্যবহার করছেন 'fantasy'। মার্জারাক্ষী অশিক্ষিতা ও বারাঙ্গনা চতুরিকা নিজেকে নগরের শ্রেষ্ঠ বণিকের বাঞ্ছিতা ভেবে সুন্দরী হয়ে ওঠে যেন। সর্বশাস্ত্র এবং নৃত্যকলায় পারদর্শিতা জন্মে যায় তার। প্রকল্পনার সার্থক ব্যবহার দেখি সূর্যের রথের চাকা মাঝ আকাশে বসে যাবার গুজবে। সবাই ভীত হচ্ছে এই ভেবে যে রাত আর নাও আসতে পারে — দিনই থেকে যাবে বছরের পর বছর।

সমগ্র আখ্যানটিতে অমর মিত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন এক রহস্যের আবরণ। যে-রহস্য সবচেয়ে বেশি ঘনীভূত হয়েছে ধ্রুবপুত্রকে কেন্দ্র করে। তার নিকটাত্মীয় আখ্যানে কেউ নেই। কিন্তু তারই জন্য সবাই অপেক্ষমান। সেই যেন সবার অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর। তার গাত্রবর্ণ থেকে কণ্ঠস্বর সবই তার অনুপস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্নভাবে কল্পনা করেছে।

> 'ধ্রুবপুত্র গৌরবর্ণের যেমন হতে পারে, তাম্রবর্ণেরও। আবার শ্যামবর্ণেরই বা কেন নয়? নিষাদের মতো হতেও পারে সে। আবার না হতেও পারে। তার কণ্ঠস্বর গম্ভীর, পুরুষালি হতে পারে আবার সুরেলা মায়াময় হতেও পারে। সবই যেন সত্য। কবে কতদিন আগে আসত ধ্রুবপুত্র এখানে, তারপর চলে গেল উজ্জয়িনী ছেড়ে। তাকে যেন কোনোদিন নিজ চোখে দ্যাখেনি পরাশর, তার কথাই শুনেছে শুধু। ধ্রুবপুত্রের কথা অন্যজনের কাছে শোনা, যেমন সে ধ্রুবপুত্রের মুখেই শুনত গ্রহ-তারাদের কথা, সমুদ্র, মরুভূমির কথা, আর কণ্বমুনির আশ্রমে পালিতা কন্যা শকুন্তলার কথা...। ধ্রুবপুত্রের কাছেই কি ধ্রুবপুত্রের গাত্রবর্ণ, কেশবর্ণ, চক্ষুমণির কথা, কণ্ঠস্বরের কথা শুনেছিল পরাশর? পরাশর একরকম শুনেছিল, অন্যজনেরা অন্যরকম শুনেছিল? তারা কি ধ্রুবপুত্রকে তাহলে দেখতে পেত না, তার কথা শুনে একরকম আন্দাজ করে নিয়েছিল? তা হতে পারে? হয়ত সত্য হয়ত অসত্য।'[৩৯]

সময় থেকে এগিয়ে চিন্তাভাবনা করা ক্রান্তদর্শী এই ব্যক্তিটিকে নিয়ে যে-রহস্য তৈরি হয়েছিল তা শেষে যখন ধ্রুবপুত্রের সশরীরে আবির্ভাব হয়েছে তখনও পুরো কাটেনি। আখ্যানের আগাপাশতলা বজায় রয়েছে এক কুহেলিকাময় ধূসর আস্তরণ। সময় সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নয় আর স্থান নির্দিষ্ট হয়েও যেন অনির্দিষ্ট। যে-নগরের চিত্র এই রহস্যের আলোছায়ায় উপস্থাপিত হয়েছে তা বিশাল অট্টালিকায় সুশোভিত, রত্নখচিত মন্দির এবং নয়নাভিরাম সৌন্দর্য ও ভয়ংকর যোদ্ধায় পরিবৃত রাজপ্রাসাদের জাঁকজমকে চোখ ধাঁধানো

নগর নয়। পড়তে পড়তে এক সময় দেখি প্রাচীন কিংবদন্তি অথবা ইতিহাসের উজ্জয়িনী নগরী অথবা অবন্তীরাজ্য আমাদের কল্পনায় ধরা পড়েছে একান্ত আমাদের নিজস্ব শহর হয়ে। যেখানে জ্ঞান এবং প্রেমের অভাবে মানুষের মন হয়ে আছে বন্ধ্যা, অনুর্বর। সেখানে জ্ঞান এবং ভালোবাসার ছোঁয়াতেই নিবিড় হতে পারে মেঘের নীলাঞ্জন ছায়া। জাগবে জীবনের প্রতি প্রেম। অস্থিরতার অবসান ঘটবে। মানুষের মধ্যে তৈরি হবে সহনশীলতা। বাঁচার সঙ্গে সঙ্গে বাঁচানোর ও বাঁচতে দেওয়ার মনোভাব গড়ে উঠবে। এই প্রসঙ্গে মনে আসতেই পারে ইতালো ক্যালভিনোর বিখ্যাত উপন্যাস 'Invisible Cities'-এর কথা। ক্যালভিনো এই উপন্যাসে পঞ্চান্নটি বিভিন্ন শহরের বর্ণনা দিয়েছেন। মার্কো পোলো এই শহরগুলির কথা বর্ণনা করেছেন কুবলাই খানের কাছে। মার্কো পোলোর 'The Travels of Marco Polo'র কোনো সম্বন্ধ নেই। সম্পূর্ণ কাল্পনিক মার্কো পোলো কাল্পনিক আরেকটি চরিত্রের কাছে যা বর্ণনা দিচ্ছে তা যেন অন্য এক ইতিহাস বা ইতিহাসের বিকল্প কিছু। ক্যালভিনো তাঁর লেখায় আমাদের কিছু একটা প্রথমে দেখিয়ে তারপরেই দেখান এরকম কিছু হয় না। তিনি বাস্তবকে দেখান যেন খ্যাপা আয়নায় ফেলে, যেভাবে আমরা দেখিনি। তিনিও কল্পিত কিছু শহরের বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের নিজের শহরই নতুন করে দেখান। তাঁর কাল্পনিক শহরের বর্ণনা আমাদের কল্পনাকে উসকে দেয় আবার মনে করিয়ে দেয় আমরা বাস্তবের বাসিন্দা, আমরা কেমন করে কীভাবে বাঁচি এবং প্রশ্ন মনে জাগিয়ে দেয় যে আমরা যা যা করি তা কেন করি। এই সব বৈশিষ্ট্যের সন্ধান তো আমরা পাই 'ধ্রুবপুত্র'-এও। অমর মিত্র নিজে একটি সাক্ষাৎকারে 'Invisible Cities'-এর উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়—

> 'ইতালো ক্যালভিনোর ইনভিজিবল সিটিজ পড়ে গোপন অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম যেন। 'ধ্রুবপুত্র' যখন লিখি তখন এই উপন্যাসটি হাতে আসে। দুটি বিষয় আলাদা, কোনো মিলই নেই কিন্তু আমাকে যেন সাহস জুগিয়েছিল। পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল। ইনভিজিবল সিটিজ এক আশ্চর্য গ্রন্থ। এই লেখক উত্তেজিত করেন না, সমাহিত করেন। বহুদিক ধরে ধ্রুবপুত্র লেখার সময়ে নিস্তব্ধতা দিয়েছিল আমাকে ওই গ্রন্থটি।' [৪০]

দশ

"To see means to perceive differences.'

ইতালো ক্যালভিনোর এই উক্তি যে-কোনো সার্থক ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় চিন্তাসূত্র। অমর মিত্র তাঁর লেখালেখির ক্ষেত্রে সম্ভবত এই ভাবনাটিকে মনে রেখে এগিয়েছেন। তাই তিনি চৈতন্যের মড়ক, অদ্ভুত অন্ধকার, ভয়ংকর নৈরাশ্যের মধ্যে আশার আলো দেখতে পেয়েছেন। জ্ঞান এবং প্রেমের মধ্যেই তিনি সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। ক্ষমতার কেন্দ্রে অজ্ঞানতা বাস করে। যত ক্ষমতা ততই অজ্ঞানতা। রাজা তাঁর রাজ্যে কোথায় কী হচ্ছে কিছুই জানতে পারেন না। কেন রাজ্যে একের পর এক অঘটন ঘটে যায় তা তিনি কিছুই জানতে পারেন না। রাজা দায় চাপান প্রকৃতির ঘাড়ে। ক্ষমতার কাঠামোর ধূলিসাৎ করে দেওয়া তা হলে জ্ঞানের লক্ষ্য হতে পারে। ধ্রুবপুত্র রাজাকে নিয়ে এসেছে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে। একে একে শুনিয়েছেন রাজার অজানা নানা তথ্য। সে জানে বৃষ্টি একদিন হবেই আজ না হোক কাল। সে রাজাকে পড়ে শোনায় বৃষ্টির মন্ত্রের কাব্য— 'মেঘদূত'।

আর একই সঙ্গে অন্যদিকে ঘটেছে আরো একটি ঘটনা। গন্ধবতী যে বারবার অত্যাচারিত হয়েছে প্রতাপের দ্বারা, রাজকর্মচারী উদ্ধবের দ্বারা এবং যে ছিল ধ্রুবপুত্রের জন্য অপেক্ষারতা, যে ধ্রুবপুত্রের ফিরে আসার আশা ত্যাগ করে বিয়ে করেছে বৃষভানু শিষ্য তাম্রধ্বজকে। বিবাহের পর তারা দশার্ণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে নগর থেকে খানিকটা দূরে ঠাঁই নিয়েছে রাতটুকুর জন্যে। ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল রাজধানী থেকে দূরে এসে তারা নিরাপত্তা বোধ করেছে। রাষ্ট্রের কর্মচারীদের থেকে লোলুপ থাবা নিরাপদ দূরত্বে পরম আশ্লেষে গন্ধবতী ডেকেছে তার নববিবাহিত পুরুষটিকে।

লক্ষণীয় বিষয় হল, আখ্যানের শেষ দিকে ক্রিয়াপদের ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়েছে বেশ কিছু বাক্যে, আর বারবার ব্যবহৃত হয়েছে 'হয়ত' শব্দটি। আর তার ফলে ব্যক্ত হয়েছে সম্ভাবনা — বৃষ্টির সম্ভাবনা। নারীপুরুষের প্রেমপূর্ণ মিলনে বৃষ্টি হওয়ার যে প্রত্নকথা তা তো বেজে উঠলই, সেই সঙ্গে বেজে উঠেছে কিছু সম্ভাবনার সুর। নিষাদদের গ্রাম থেকে শহরে আসার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে প্রান্ত দিয়ে কেন্দ্রকে ঘিরে ধরবার ব্যঞ্জনা। বন্ধ্যা প্রকৃতি, বন্ধ্যা মনের অপেক্ষা শেষ হল ভালোবাসার বৃষ্টির মাধ্যমে। তাহলে অন্তিমে কি ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পরিসমাপ্তি ঘটল? অবশ্যই তা নয়। কিন্তু এই সময়ে সম্ভাবনার আশা না থাকলে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটাই মরে যাবে। বৃদ্ধ পরাশর তাই সৃষ্টি করেছিল শুকনো সাগরে জল ওঠার অলীক স্বপ্নের কথা। কবি রচনা করেন বৃষ্টির মন্ত্র, যে মন্ত্রে বৃষ্টি নামতে পারে। আর 'ধ্রুবপুত্র'ও

হয়ে ওঠে বৃষ্টির মন্ত্র। কারণ উপন্যাসটি আমাদের দীর্ঘ অনাবৃষ্টির মধ্যে শুনিয়েছে বৃষ্টির আগমনের সম্ভাবনার কথা। ফলে 'ধ্রুবপুত্র' হয়ে ওঠে নানা পরাভাষ্যের আকর, মুক্ত পাঠকৃতির একটি দৃষ্টান্ত।

অশ্বচরিত—

১. তাপস ভৌমিক সম্পদিত, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫ পৃষ্ঠা-১১৬।

২. সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কেন লিখি, পৃষ্ঠা-২৪৫।

৩. সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত, অমৃতলোক (৯৭), অমর মিত্র বিশেষ সংখ্যা, ২০০৩, সাক্ষাৎকার, পৃষ্ঠা-৩৩০।

৪. তপোধীর ভট্টাচার্য, আখ্যানের স্বরান্তর, দিবারাত্রি কাব্য, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, পৃষ্ঠা-১৩২-১৩৩।

৫. অমর মিত্র, অশ্বচরিত, করুণা প্রকাশনী কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, ২০০২, প্রচ্ছদপট।

৬. সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত, অমৃতলোক (৯৭) অমর মিত্র বিশেষ সংখ্যা, মার্চ, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩৩৫।

৭. অমর মিত্র, অশ্বচরিত, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, ২য় সংস্করণ, ২০০২, পৃষ্ঠা-১।

৮. সুন্দর বৈশাখ ১৪০৭ (ছন্দক আর কন্থকের কথা অমর মিত্র)

৯. অমর মিত্র, অশ্বচরিত্র, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯ ২য় সংস্করণ ২০০২, পৃষ্ঠা-২০৯।

১০. জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা-৭৩, নবং মুদ্রা, জুন ২০০১, পৃষ্ঠা-১১০।

১১. Geam Baudrillard, Cool Memories, Newyork, Verro, 1994.page-6.

১২. মদনমোহন গুহ, তুমি থেকে বয়নেট, ভারতী বুকস্টল, কলকাতা-০৯ দ্বিতীয় সংস্করণ বইমেলা ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৪৭।

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৭৬।

১৪. সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত, অমৃতলোক (৯৭), অমর মিত্র বিশেষ সংখ্যা মার্চ ২০০৩, পৃষ্ঠা-৪২১।

১৫. অমর মিত্র, অশ্বচরিত্র, করুণা প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ ২০০২, পৃষ্ঠা-১১৯।

১৬. তপোধীর ভট্টাচার্য, আখ্যানের স্বরান্তর, দিবারাত্রি কাব্য, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, পৃষ্ঠা-১৪১।

১৭. অমর মিত্র, অশ্বচরিত্র, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, ২য় সংস্করণ ২০০২, পৃষ্ঠা-১০৪।

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা-১১৬।

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৮।

২০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১।

২১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২।

২২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৮।

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৯২।

২৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৯২।

২৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১৩।

২৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯৭।

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮৫-১৮৬।

২৮. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৭।

২৯. তাপস ভৌমিক সম্পদিত, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক্ শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৭, পৃষ্টা- ১৯।

৩০. অমর মিত্র, অশ্বচরিত্র, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, ২য় সংস্করণ ২০০২, পৃষ্ঠা-২৭৯।

৩১. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩১।

৩২. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮৮।

৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৯২।

৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯৫।

৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৭-৩২৮।

৩৬. তপোধীর ভট্টাচার্য, আখ্যানের স্বরান্তর, দিবারাত্রি কাব্য,কলকাতা-১২, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭,

৩৭. অমর মিত্র, অশ্বচরিত্র, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, ২য় সংস্করণ ২০০২,

৩৮. Geam Baudrillard, Cool Memories, Newyork, Verro, 1994.page-4.

৩৯. জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা-৭৩. নবম মুদ্রণ, জুন ২০০১, পৃষ্ঠা-৪১।

ধ্রুবপুত্র —

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, বি(েভারতী, পৃ. ২৯৮।

২. তদেব, পৃ. ৪০৭।

৩. আফিফ ফুয়াদ সম্পাদিত দিবারাত্রির কাব্য, উপন্যাস সংখ্যা-৩, ১১ বর্ষ, জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৩, পৃ. ২৬৭।

৪. সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত অমৃতলোক, অমর মিত্র বিশেষ সংখ্যা ২০০৩, সংখ্যা ৯৭, পৃ. ৩১৫-৩১৬।

৫. তাপস ভৌমিক সম্পাদিত কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক্-শারদ সংখ্যা ১৪১৫, পৃ. ১২০।

৬. সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত অমৃতলোক ৯৭ ঃ মার্চ ২০০৩, অমর মিত্র বিশেষ সংখ্যা, পৃ. ৩৪৪।

৭. অমর মিত্র, ধ্রুবপুত্র, ক(ণা প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ৩৫৮।

৮. সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত অমৃতলোক ৯৭ ঃ মার্চ ২০০৩, অমর মিত্র বিশেষ সংখ্যা, পৃ. ৩৩৮।

৯. অমর মিত্র, ধ্রুবপুত্র, ক(ণা প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ২৬৪।

১০. William Shakespeare, Julius Caesar, Oxford University Press, Kolkata-91, First Indian Impression 1975, 2000, p. 114.

১১. অমর মিত্র, ধ্রুবপুত্র, ক(ণা প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ৩৫৮।

১২. তদেব, পৃ. ৩৫৯।

১৩. তদেব, পৃ. ৩৫৯।

১৪. D. N. Jha, Ancient India – An Introductory Outline, New Delhi, 1983, p. 116.

১৫. Charles Dickens, A Tale of Two Cities, Oxford University Press, New York, 2004, p. 7.

১৬. তাপস ভৌমিক সম্পাদিত কোরক ঃ প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫, কলকাতা-৫৯, পৃ. ২৯৪।

১৭. নরেশচন্দ্র জানা সম্পাদিত অনুবাদে মেঘদূত ঃ সার্ধশতবর্ষ, সাহিত্যলোক, বিডন ষ্ট্রিট, কলকাতা-৬, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৬।

১৮. তদেব, পৃ. ৭।

১৯. অমর মিত্র, ধ্রুবপুত্র, ক(ণা প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, ২০০২, পৃ. ৮৬।

২০. তদেব, পৃ. ৭৪।

২১. তদেব, পৃ. ২৩৯।

২২. শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ, ভক্তি(বেদান্ত বুক ট্রাস্ট, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, প্র. সংস্করণ ২০০০, ২০০৯, পৃ. ২০১।

২৩. অমর মিত্র, ধ্রুবপুত্র, ক(ণা প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, ২০০২, পৃ. ১৪২।

২৪. দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, নরবলির ইতিহাস, সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৩৪।

২৫. অমর মিত্র, ধ্রুবপুত্র, ক(ণা প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, ২০০২, পৃ. ২৪২-২৪৩।

২৬. তদেব, পৃ. ১৬১।

২৭. তদেব, পৃ. ১৬২।

২৮. সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত অমৃতলোক ৮১, ১৯৯৮, পৃ. ১৬১।

২৯. অমর মিত্র, ধ্রুবপুত্র, ক(ণা প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, ২০০২, পৃ. ১৪৩।

৩০. তদেব, পৃ. ২৪৯।

৩১. তদেব, পৃ. ১১২।

৩২. তদেব, পৃ. ১১২।

৩৩. তদেব, পৃ. ২৮৪।

৩৪. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, দহন, আনন্দ পাবলিশার্স, জুন ২০০৭, পৃ. ১২১।

৩৫. অমর মিত্র, ধ্রুবপুত্র, ক(ণা প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, ২০০২, পৃ. ৩৬।

৩৬. তদেব, পৃ. ১০৮।

৩৭. তদেব, পৃ. ২৬৬।

৩৮. সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত অমৃতলোক ৯৭, মার্চ, ২০০৩, অমর মিত্র বিশেষ সংখ্যা, পৃ. ৩৪৬।

৩৯. অমর মিত্র, ধ্রুবপুত্র, ক(ণা প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, ২০০২, পৃ. ২০৭।

৪০. সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত অমৃতলোক ৯৭, মার্চ, ২০০৩, অমর মিত্র বিশেষ সংখ্যা, পৃ. ৩৩২।

উপসংহার

> 'Writer must be as objective as a chemist, he must abandon the subjective line, he must know that dung heaps play a very respectable part in a land scape, and that evil passions are as inherent in life as good ones.' (Letters on the short story, the Drama and other literary Topics ; selected and edited by Louis Niedland. New York 1924. Page-275-276/ Anton Chekhov)

চেকভ চিঠিতে এই মত বারবার প্রকাশ করেছেন যে লেখক কোনো কুশীলব বা তার কথাবার্তার বিচারক হবেন না, তাঁর কাজ হবে কেবল প্রত্যক্ষ করা। সাহিত্যিক চরিত্রদের বিচার করতে যাবেন না, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বলে কি কোনো অবস্থান থাকতে পারে? এ কথা সত্যি—

> 'সংসারে কিছুই ফেলা যায় না। আবর্জনাও সার হয়। পুরীষের দুর্গন্ধও পারিজাতের সৌরভে পরিণত হয়। তবে জানা চাই!' *(চন্দ্রগুপ্ত/দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)*

সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত এই মন্তব্য থেকে মনে হয় এই জানার প্রেক্ষাপট কোনো সাহিত্যিকের জন্যে তৈরি করে তাঁর নির্দিষ্ট সামাজিক-নান্দনিক-রাজনৈতিক ভাবাদর্শ। প্রবহমান সময়, বৃহত্তর ইতিহাসকে তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেন সেই অবস্থানে দাঁড়িয়ে। পায়ের নিচে যদি শক্ত জমি না থাকে তবে ঘূর্ণীজলে ভেসে কি দেখা সম্ভব? সাহিত্যিকের পায়ের নিচের জমি হল তাঁর ভাবাদর্শগত অবস্থান। বিশেষত সময় যখন দ্রুত তার চরিত্র পাল্টে ফেলতে থাকে তখন স্রোতে গা ভাসিয়ে কি সৎ সাহিত্যিক হওয়া যায়? বিশ্বায়নের বেনো জলের সহগামী জঞ্জাল ছড়িয়ে পড়ছে এ সময়ে সর্বত্র। কিন্তু গত চার পাঁচ দশক ধরে যেভাবে বিশ্বায়ন নিয়ে কথা হচ্ছে তার আগে তো হয়নি, এর মানে কি এ জাতীয় ধারণা আগে ছিল না? অথচ ভারতবর্ষের প্রাচীন মন্ত্র 'বসুধৈব কুটুম্বকম্', রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীয় ভিত ছিল এক স্বপ্ন—'যত্র বিশ্ব ভবতি একনীড়ম্', মার্ক্সও তো বলেছিলেন ইন্টারন্যাশনেলিজম-এর কথা, বলেছিলেন 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'। কিন্তু আজ যে বিশ্বায়নের কথা বলা হচ্ছে তার মূল মন্ত্র দুনিয়ার বাজার এক হও। পণ্য, বাজার আজকের বিশ্বায়নের লক্ষ। বাজারের সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছে মিডিয়া। বিজ্ঞাপনের পঞ্চশরে আমরা রোজ নতুন দ্রব্যের প্রেমে পড়ছি। এমন অবস্থায় সাহিত্যিকরা নিজেদের বিশিষ্ট করেন

নিজেদের ভাবাদর্শ দিয়ে। মুঠো খুললেই যে সময় হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তার স্বর ও অন্তঃস্বর বুঝে নেওয়া সোজা নয়। সব ঔপন্যাসিক যে তা পারছেন তাও নয়। তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্য আক্ষেপের সঙ্গে উচ্চারণ করেন—

> 'স্বভাবত কোন বই পড়তে হবে, কাকে ভালো বলতে হবে— তাও নিধারণ করে দিচ্ছে এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার মালিক পক্ষ।... আমরা যারা সোশিয়েল সেমিওটিক্স বা সামাজিক চিহ্ন তত্ত্ব নিয়ে ভাবি, লিখি—তারা পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়ি ইঁদুর দৌড়ে। এত দিনকার অধ্যবসায়ে গড়ে তোলা তিলোত্তমা তত্ত্বচিন্তার সঙ্গে আপোষ করে—ঐসব বেষ্টসেলারের সমাজতত্ত্ব এবং কেনা-বেচার প্রকরণ সংক্রান্ত চিহ্নতত্ত্ব উপেক্ষা করে—এদের নিয়ে লিখি। যত্নরচিত পাঠতত্ত্ব যদি সব অসঙ্গতির কুয়াশা সরিয়ে রৌদ্রালোকে দাঁড়ানোর জন্য ব্যবহার করি অন্যত্র, আধুনিকোত্তর প্রতিজগতের ঐসব চিহ্নায়কে নিজেদের সম্পৃক্ত করার জন্যে কেন এই আত্মবিস্মৃত ব্যাকুলতা?'[১]

প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই নন্দিনী শোনায় জীবনের গান। উপনিষদের কবিদের প্রার্থনা ছিল—

> 'অসতো মা সদ্গময়
> তমসো মা জ্যোতির্গময়
> মৃত্যোর্মামৃতং গময়...'

রাতের সব চেয়ে কালো মুহূর্তের পর ঊষার আলো ফুটে ওঠে। স্বাধীন চিন্তাচেতনার উপর যখন বুলডোজার চালানো হচ্ছে, তখনো ব্যতিক্রমী কিছু কথাকার তৈরি আছেন যাঁরা পৃথিবী জুড়ে এক গল্পের বিরোধিতা করেন। তাঁরা যৌনতা, প্রেম আর সন্ত্রাস দিয়ে গড়ে তোলা কাহিনির বিরুদ্ধের দাঁড়িয়ে না কাহিনি শোনান, জীবনসত্যের উন্মোচনে তাঁরা প্রচেষ্টা চালান। আমাদের এই অভিসন্দভের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি সেইরকম ব্যতিক্রমী আজকের কথাকারাদের লিখন শৈলীর বৈশিষ্ট্য। সেইসঙ্গে প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে প্রস্তুত করার মতোই এই আলোচনার নির্বাচিত চারজন উপন্যাসিকের নির্বাচিত চারটি উপন্যাসে প্রবেশের সূত্র সন্ধান করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

লেখকের মৃত্যু ঘটে যায় লেখার পরে, তারপরে সব দায় পাঠকের। লেখা একবার শেষ হয়ে গেলে, লেখকও তাঁর নিজের লেখার পাঠকমাত্র। আর পাঠক বারবার তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, সময়, ভাবাদর্শ ইত্যাদির রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে দেখে নিতে চান পাঠকৃতি। পাঠের অনন্ত প্রক্রিয়ার পাঠকও তাঁর মতো করে

শুরু করেন লেখা। 'নিবিড় পাঠ' মানে—

> 'অন্তহীন তাৎপর্যের বহমান ধারা থেকে একটি গন্ডূষমাত্র তুলে আনা। অতি উদ্ভাসনের কেন্দ্রে সোচ্চার নৈঃশব্দ্যের পরিসর আবিষ্কার করা। কেন্দ্র ও পরিধির নতুন দ্বিরালাপ নির্ণয় করা। এইজন্যে পাঠক সেই অভিযাত্রী আপাত-বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে শৃঙ্খলাকে দেখতে পায় আবার নিজের দেখাকে নিজেই প্রত্যাহ্বান জানায়। চিহ্নায়ক থেকে চিহ্নায়িতে গিয়ে প্রত্যাবর্তনের জন্যে নতুন পথ তৈরি করে নেয়। পাঠকৃতি তাঁর জন্যে সেই বিনির্মাণের প্রক্রিয়া যা অনবরত নতুন বিন্দুতে আরম্ভ হয়। তিনিই ঘোষণা করতে পারেন ঃ 'I name, I unname, I rename; thers passes the text ; it is a nomination in the becoming.' (S/Z : 17-18)। আর, তাই পড়া মানে হয়ে ওঠা, অন্তর্ভেদ দৃষ্টির শক্তি ও লাবণ্যে সঞ্জীবিত হওয়া।'[২]

কোনো আলোচনাই ভরতবাক্য নয়। শেষ কথা বলে কোনো কিছু হতেই পারে না। এই অভিনন্দর্ভে সামান্য পরিসরে সেই উপন্যাসিকদের সম্বন্ধে কিছু কথা বলার প্রয়াস করা হয়েছে যারা ঘোর অন্ধকারে আলোর দিশারী, যাঁরা মৃত্যু উপত্যকাকে অস্বীকার করে জীবনের গান শোনান।

সাধন চট্টোপাধ্যায় এই সময়ের এমন একজন কথাকার যিনি বুঝতে পারছিলেন সময়ের নতুন সমিধকে ধারণ করার জন্য প্রচলিত আখ্যান প্রকরণ যথেষ্ট নয়। তাঁর নতুন করে প্রকাশের তৃষ্ণা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিকের পরীক্ষা নিরীক্ষাতে। কেবল উপন্যাস নয় ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর পরীক্ষা নিরন্তর ক্রিয়াশীল। নিটোল কাহিনির মায়াকে অস্বীকার করেই তাঁর আখ্যান গড়ে ওঠে। জলতিমির-এ কালীয় দমনের মিথকে আর্সেনিক পীড়িত পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে যে কাহিনী গড়ে ওঠে তা বিশেষ মনোনিবেশের দাবি রাখে। কারণ পুরাকথা নবনির্মিত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। জলে কালীয়নাগের বিষ আর্সেনিকের সঙ্গে একীভূত হচ্ছে। আবার বহুমাত্রিক সময়ের আখ্যান কেবল এটুকু বলেই থেকে যায় না। আসে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা। আর্সেনিকের প্রভাব কেমন করে অপুষ্টিতে ভোগা মানুষগুলোর উপর পড়ে দ্রুত এবং সহজে। কেমন করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনীতি ঢুকে পড়ে তাও সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর আখ্যানে নিয়ে আসেন। আবার প্রান্তের প্রান্তে যার অবস্থান সেই নারী কেমন করে গড়ে তোলে প্রতিরোধ তার ছবি তুলে ধরেন কথাকার অন্নপূর্ণার মাধ্যমে।

সাত বছরের ব্যবধানে লেখার ধরণ কতটা পাল্টে যায় তারই নিদর্শন 'সাতপুরুষ ডট্ কম্'।

'জলতিমির'-এর সাধন নিজেকে ভেঙে বিনির্মিত করে পৌঁছান 'সাতপুরুষ ডট্ কম্'-এর অবস্থানে। জাদু বাস্তবতার সহায়তার কথাকার তৈরি করেন অদ্ভুত জগৎ। কিন্তু সে জগৎ অপরিচিত নয় মোটেই। সাতপ্রজন্ম আগের যে উপনিবেশিক ভারতবর্ষ, তার চেহারা যেমন আসে আখ্যানে তেমনি আসে উপনিবেশিক হ্যাংওভার কাটতে না কাটতেই নয়া উপনিবেশিকতার ফাঁদে বন্দি ভারতবর্ষের কথা। প্রসঙ্গ ক্রমে আসে যে নারী স্বাধীনতা আন্দোলন ভোটাধিকার, সমানাধিকারের জন্যে শুরু হয়েছিল, সেখানে আজ নারী স্বাধীনতা অটো সেক্স-এর প্রসঙ্গে পৌঁছে যাচ্ছে আর অন্যদিকে পণ্য হিসেবে তো ব্যবহৃত হচ্ছে নারী এখনও লক্ষ্যচ্যুতি কী নিদারুণ। বৃদ্ধ কুলীনের অষ্টম তরুণী ভার্যা সাত প্রজন্ম আগে স্বামীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে আর আজ খ্যাতনামা মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক পাঠক্রমের ছাত্রী নাম (?) অথবা পকেট খরচের জন্য প্রায় নগ্ন ছবি তুলতে রাজি হয়—সভ্যতার কোন স্তরে আমরা পৌঁছোচ্ছি? স্বল্প কায়া উপন্যাসের শব্দের মধ্যে থাকা নৈঃশব্দের মাধ্যমে সাধন চট্টোপাধ্যায় যেন আশাপূর্ণা দেবীর ট্রিলজিতে উত্থাপিত প্রশ্নটিকে আবার তুলে ধরেন। সত্যবতী যে স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছিল তা পাওয়ার পর যথাযথ কাজে লাগছে কি? বকুল বারবার সেই সন্দেহ প্রকাশ করেছে। আমরাও কি সেই সন্দেহে পৌঁছাই না, যে লক্ষ্যচ্যুতি যখন কোনো কিছুর ঘটে তখন তা আরো পঙ্কিলতা সৃষ্টি করে। যেমন করেছিল নকশাল আন্দোলন। কিন্তু তাই বলে আন্দোলনটা অপ্রয়োজনীয় বা পুরো প্রচেষ্টাই জলে গেল তাও তো নয়। তবু সবই যেন এলোমেলো, লক্ষহীন এগিয়ে চলা। বেশি গতির সন্ধানই কি আমাদের লাইনচ্যুত করছে? প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যাদের মীমাংসা মেলে না। শেষ কথা বলার দায় তো লেখকের নয়, তিনি পথ প্রদর্শকও নন, লেখক কেবল সমস্যাগুলোর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর সমস্যা থেকে উত্তরণের দায় তো আমাদের।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে অভিজিৎ সেনের দুটি উপন্যাস 'রহু চণ্ডালের হাড়' ও 'বিদ্যাধরী এবং বিবাগী লখিন্দর'। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত এই লেখকের লেখায় এই বিশেষ অঞ্চলের কথা ফিরে ফিরে আসে। যদিও 'রহু চণ্ডালের হাড়'-এ যে জনগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে তারা প্রথমাবস্থায় ছিল যাযাবর। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত যে অঞ্চলে বসতি স্থাপন করছে সেটি উত্তরবঙ্গ। আসলে মূলধারার পরিপন্থি আজকের সব লেখকরাই সাধারণত একটি বিশেষ অঞ্চল, যেটি তাঁদের খুব পরিচিত, সেটি নিয়ে লিখতে পছন্দ করেন। এই ধারাটিকে এককালে খুব সহজেই আঞ্চলিক উপন্যাসের তক্মা পরানো হত। কিন্তু আজকের অবস্থানে দাঁড়িয়ে আমরা তা আর বলবনা, কারণ নির্দিষ্ট স্থান নিয়েই তো উপন্যাস, সেক্ষেত্রে সব উপন্যাসই আঞ্চলিক। আর লেখকরা এমনটা করেন, কারণ তাঁরা যতদূর সম্ভব বাস্তবের কাছাকাছি থাকতে চান—তাই পরিচিত অঞ্চল তাঁদের পছন্দের জায়গা। 'রহু চণ্ডালের হাড়'-এ আখ্যানকার আমাদের শোনান এক যাযাবর গোষ্ঠীর দীর্ঘ পথ পরিক্রমার কাহিনি। মিশে যায় এসে প্রত্নকথা, আশেপাশের জনজীবনের কথা, ইতিহাস।

এই লেখকগোষ্ঠী প্রতাপকে অস্বীকার করেন। আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে চিরসংগ্রামী তাঁদের লেখনী। ‘বিদ্যাধরী ও বিরাগী লখিন্দর’-এও সেই প্রচেষ্টাই দেখি একটু ভিন্নরূপে। এটি জনগোষ্ঠীর আখ্যান নয়, কিন্তু কেবল ব্যক্তির আখ্যানই বা বলব কেমন করে? বালা লখিন্দর ও বিদ্যাধরীর ভালোবাসা সমাজের চোখে গর্হিত কিন্তু তারা তাদের ভালোবাসার শক্তিতে সব প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করে, সমাজের বিধিনিষেধকে অস্বীকার করে। কিন্তু এখানেই কাহিনির অন্ত নয়, এ আখ্যানে যেন মনসামঙ্গলের বেহুলা লখিন্দরের কাহিনির নব রূপায়ণ ঘটেছে। সেইসঙ্গে ভারতীয় কথকতার আঙ্গিক এমনভাবে মিশে গেছে উপন্যাস প্রকরণে যে তৈরি হয় তাৎপর্যের বহুস্বর। ফলে আখ্যানটি কোনোভাবেই প্রেমকাহিনি হয়ে রয়ে যায় না। মহাসময় ও খণ্ডসময়ের দ্বিরালাপে গড়ে ওঠা আখ্যান হয়ে ওঠে।

ভারতীয় গল্প বলার শৈলী আর তত্ত্ব কথা প্রকাশের সহজ ভঙ্গি যদি উপন্যাসের ধারায় মিশিয়ে দেওয়া যায়, তবে তার আস্বাদ্যমানতা কি হতে পারে তা যদি কারো জানার ইচ্ছা থাকে, তবে ভগীরথ মিশ্র তাঁর অবশ্য পাঠ্য। মানবমনের জটিলতম গ্রন্থি উন্মোচন তিনি করতে চান সহজতম বাক্যবিন্যাসে। ভারতবর্ষের মতো বিশালাকার গ্রামে বসবাস করে গ্রামের কথা না বললে কলমশুদ্ধি হয় না বলে তাঁর বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের জায়গা থেকে তিনি লিখে চলেন তাদের কথা যারা চির প্রান্তিকায়িত। ‘চারণভূমি’ উপন্যাসে ভেড়া চরোয়া বিহারের ভকত্ সম্প্রদায়ের কথা বলতে গিয়ে প্রতাপের রাজনীতির কথাও বাদ যায় না। কিভাবে অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপের রাজনীতি তাদের ঘর ছাড়া করে ঠেলে দেয় পথের অনিশ্চিত জীবনে।

কুসংস্কারও কখনো কখনো হয়ে পড়ে প্রতাপের হাতিয়ার। ‘জানগুরু’ উপন্যাসে দেখি শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত প্রায় একটি গ্রামের স্বাধীনতার অত বছর পরও জানগুরু, ওঝারা আসর জমিয়ে বসে আছে। পঞ্চায়েতে সদস্য নিজে একজন জানগুরু। স্কুল আছে, কিন্তু স্কুলের শিক্ষকরা পর্যন্ত স্থিতাবস্থার পৃষ্টপোষক। জাত-বেজাত, ভূতে ধরা, ডাইনি ইত্যাদির সংস্কার তাঁদের মনেও বহুদূর পর্যন্ত শিকড় বিস্তৃত করেছে, তাই কেউ এসবের বিপক্ষে দাঁড়ালে, তাঁরা দাঁড়ান সেই ব্যক্তির বিপক্ষে। কথাকার শল্যচিকিৎসকের মত কাটাছেঁড়া করে দেখিয়েছেন ডাইনি প্রথা বা এজাতীয় প্রথার পেছনে কীভাবে কাজ করে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ। তবে এ সময়ের কোনো আখ্যানকারই বিশ্বাস করেন না যে অন্ধকার নিরাশাই শেষ কথা। তাঁরা আমাদের সমস্যার কথা জানান কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন সমস্যা সমাধানের পথ তখনই পাওয়া যাবে যখন আমরা সমস্যার সামনে দাঁড়াব। ‘এই সময়’ নামক এক প্রবন্ধে কেতকী কুশারী ডাইসন অন্য এক প্রসঙ্গে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—

'...সংকটের মুখোমুখি না হতে পারলে সমাধানের পথও খুঁজে পাওয়া যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকার আর্চবিশপ ডেসমণ্ড টুটু এই সময়ের এমন একজন মানুষ, যিনি মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। কিছুদিন আগে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি সহাস্যে একটা কথা বললেন, যারা বাংলা করা যায় এভাবে ঃ 'আমি বলতে ভালোবাসি যে আমি আশাবাদী নই, কিন্তু আমি আশার পিঞ্জ্বরে বন্দী।' তিনি আরও ব্যাখ্যা করলেন তাঁর প্রিয় ভাবনা 'উবুন্টু'কে। 'উবুণ্টু' হচ্ছে বাণ্টু ভাষাগোষ্ঠীর একটি শব্দ, যা মানুষের মনুষ্যত্বকে সংজ্ঞায়িত করে তার পরস্পরসম্পৃক্ত অবস্থায় নিকষে। মানুষ মানুষ হয় অন্যদের সঙ্গে তার মিথস্ক্রিয়ার গুণে। 'তুমি মানুষ বলেই আমি মানুষ, তুমি না থাকলে আমি মানুষ হতাম না।' তাঁর এই কথাগুলি আমার মনকে বন্দী করে নিয়েছে। আজ আমাদের সব মানুষের স্বার্থেই এই সময়ের বৃহত্তম সংকটের সম্মুখীন হতে হবে।'[৩]

দীর্ঘ এ উদ্ধৃতি অনেকখানিই আমাদের প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যায়। মনে পড়ে যায় বাখতিনের দ্বিবাচনিকতার প্রসঙ্গ। আসলে যা বলার ছিল, তা হল সংকটের সামনে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে-এ কথা আমাদের বলেন ভগীরথ মিশ্রও তাঁর কাহিনির মাধ্যমে। তাই 'চারণভূমি'র সমাপ্তিতেও মুন্‌সী প্রতিরোধ আর পলায়নের মধ্যে বেছে নেয় প্রতিরোধের রাস্তা আর 'জানগুরু' উপন্যাসে ফুলমতীও জীবনের রাস্তাকে বেছে নেয়, অপেক্ষা করে নবজন্মের। চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ভগীরথ মিশ্রের এ দুটি উপন্যাসের।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে অমর মিত্রের দুটি উপন্যাস 'অশ্বচরিত' ও 'ধ্রুবপুত্র'। পরমাণু বোমার মারণযজ্ঞ দেখেও পৃথিবীবাসী আজও যে সচেতন হচ্ছে না, এ বিষয়ে সচেতন মানুষদের চিন্তার বিষয়। অমর মিত্র সখেদে লক্ষ করেন যে ভারতবর্ষে এককালে শান্তির বাণী প্রচার করেছে দিকে দিকে, সেই ভারত পরমাণু বোমার পরীক্ষা করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ় করার জন্য। আর এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করার নামে জমি অধিগ্রহণে ঘর ছাড়া হয় দরিদ্র কৃষিজীবি মানুষ। তাদের কোনো পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় না, পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় করা হয় না, এছাড়া থাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সরকারি মদত পুষ্ট দালালদের আস্ফালন—শান্তি কোথায়? তাই শান্তির বাণী প্রচারক বুদ্ধের বাণী, তাঁর শেষ চিহ্ন হারিয়ে যায়— মৃত্যুর করালমুখ তাকে গ্রাস করে নেয়। একটি ঘোড়ার হারিয়ে যাওয়ার কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে যায় এত কিছু। কোনো শব্দই পুরোপুরি হারিয়ে যায় না। শান্তিদূতের স্মৃতি তাই মরণোন্মুখের মস্তিষ্কে জেগে থাকে। বেঁচে থাকে কিছু প্রতিবাদী চরিত্র যারা প্রতাপের মুখ থেকে ভালো মানুষীর মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য সংকল্প নিয়ে পথে নেমে পড়ে।

'ধ্রুবপুত্রে'র মতো উপন্যাসে অমর মিত্র দেখান দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়ের অন্তঃস্বর কি যথার্থই পরিবর্তিত হয়েছে? ভারতীয় ইতিহাসের স্বনামধন্য শহর উজ্জয়িনী কি যথার্থই এতটা সমৃদ্ধ ছিল, যতটা ইতিহাস জানাচ্ছে? জ্ঞানহীন এক শহরের সঙ্গে আমাদের আজকের শহরের পার্থক্য কতটুকু? আমরা শিক্ষিত কিন্তু জ্ঞান কোথায়? জ্ঞান থাকলে চতুর্দিকের আজ যা ঘটে চলছে তা কি হত? রাতের শহর মেয়েদের জন্যে নিরাপদ আর থাকচ্ছে না, গৃহকোণই বা তার জন্যে কতটা নিরাপদ? পুলিশ প্রশাসন মানুষের নিরাপত্তার জন্যে কিন্তু এক শ্রেণীর পুলিশই তো অত্যাচারের মূল হোতা হয়ে দাঁড়ায় অনেক ক্ষেত্রে। খরাপীড়িত দেশে স্বঘোষিত ভগবানরা জলের অপচয় করে, আর সেই দেশেরই মন্ত্রী বলেন জনগণই খরার জন্যে দায়ী। বর্তমান এই সময় ধরা পড়ে হাজার বছর আগের এক নগরের দর্পণে। পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে এসব বিস্তৃত আকারে।

আখ্যানের যে নতুন ধারা জন্ম নিয়েছে এই লেখকদের হাতে তাঁরা মূলত প্রান্তিকায়িতদের নিয়ে লেখালেখি করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠান বিরোধী, আধিপত্যবাদ বিরোধী আখ্যান রচনা করা। তাঁরা কাহিনির মায়াকে অস্বীকার করে জীবন সত্যকে আবিষ্কার করতে চান। তাঁরা সিসিফাসের অধ্যবসায় নিয়ে চেষ্টা করে যান সময়ের স্বর ও অন্তঃস্বর বোঝার এবং তৈরি করে চলেন প্রতিবেদন তাঁদের সেই অনুসন্ধান যাত্রার। সময়ের বিচিত্র কূটাভাস বিপন্নতা ও সমৃদ্ধি তাঁরা দেখেন আর দেখান। সমসাময়িক লেখকদের লেখা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে নিজের পছন্দ বারবার দৃষ্টিকে অচ্ছন্ন করে নেয়—এ সমস্যাকে যতদূর সম্ভব কাটিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। অনেক কথাই না বলা রয়ে গেল, আগামী আলোচকরা সেই কথাগুলো বলবেন আশা থাকল। আপাত সমাপ্তি ঘোষণা করার আগে তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য তুলে ধরছি—

> 'আধুনিকতাবাদ যেখানে কালজ মুদ্রাদোষের চাষ করে পাঠকৃতিকে এবং সূত্রধাররূপী পাঠককে শ্বাসরুদ্ধ করেছিল, নতুন চেতনা সেখানে খণ্ডকালের হাতছানিকে উপেক্ষা করে, লেখক এবং পাঠক—দু'জনকেই, সমস্ত ধরনের অভ্যাসজারিত শৃঙ্খল-মোচনে উদ্বুদ্ধ করেছে। লোকায়ত জীবন এবং ঐতিহ্যভাবনা আজকের লিখন-প্রক্রিয়াকে এমন পরাবয়নের উদগাতা করে তুলছে, প্রথাসিদ্ধ অর্থে যার কোনো উপসংহার থাকতে পারে না। নানা ধরণের দ্বন্দ্বে ক্লিষ্ট মানুষ তার পাঠকৃতিকে আরো বিন্যস্ত করবে, এইটে নির্ভর করছে উত্তরণ আকাঙ্ক্ষার নিরবচ্ছিন্নতায়। এই আলোচনা চূড়ান্ত পাঠ উচ্চারণ করতে পারেন কোনো যোগ্য পাঠক, আপাতত এখানে রোলা বার্তের বিখ্যাত মন্তব্যটি

স্মরণ করছি শুধু 'The text is a weapon against time, oblivion and the trickery of speech, which is so easily taken back attered, denied...The text is a moral object : it in the written in so far as the written participates in the social contract' (Theory of the Text. 32)।[৪]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তপোধীর ভট্টাচার্য/নিবিড় পাঠের নন্দন/ অক্ষর পাবলিকেশনস্/জানুয়ারি ২০০২/পৃ.২৮।

২. তদেব, পৃ.৩৩।

৩. দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (স.) পরিকথা/দ্বাদশ বর্ষ/ প্রথম সংখ্যা/ডিসেম্বর ২০০৯/ পৃ.৯১।

৪. তপোধীর ভট্টাচার্য/নিবিড় পাঠের নন্দন/অক্ষর পাবলিকেশনস্/ জানুয়ারি ২০০২/ পৃ. ।